বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

(ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রহ. এর যাদুল মা'আদ হতে সংক্ষেপিত)

ড. আহমাদ ইবন উসমান আল-মাযইয়াদ

অনুবাদ: মুহাম্মাদ আলীমুল্লাহ

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013 - 1435

IslamHouse.com

هدي محمد ﷺ في عباداته ومعاملاته وأخلاقه

« باللغة البنغالية »

(مختصر من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله)

اختصره

د. أحمد بن عثمان المزيد

ترجمة: محمد عليم الله بن إحسان الله

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1435

IslamHouse.com

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল-হামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, ওয়া আলা 'আলিহী ওয়া সাহবিহী। ওয়াবা'দ

অতঃপর নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত হলো ইসলাম, ইসলাম আল্লাহর মনোনীত স্বভাবজাত এবং ন্যায়নীতি-ভারসাম্য, মধ্যমপন্থী দ্বীন, ইসলাম দুনিয়া-আখেরাতের সকল কল্যাণ ও মঙ্গলকে আবেষ্টনকারী এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আখলাক- চরিত্রের দ্বীন, ইসলাম স্থান-কাল নির্বেশেষে সবার জন্য উপযোগী, ইসলাম সহজ-সাধ্য ও শান্তির দ্বীন, বরং ইসলামে রয়েছে সব সমস্যার সমাধান। অতএব, বর্তমান যুগে বিশ্ব মানবতার সামনে ইসলামের সৌন্দর্য্য ও মৌলিক বৈশিষ্টাবলীর বর্ণনা কতই না জরুরী; যাতে বিশ্বের সামনে দ্বীন ইসলামের প্রকৃত ছবি ফুটে উঠে। মূলত বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শ হলো এই মহান দ্বীনের বাস্তব প্রয়োগ ও ব্যাখ্যাস্বরূপ, তাঁর আদর্শমালায় রয়েছে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর সমাহার, যার ফলে দ্বীন ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করা সহজসাধ্য হয়েছে; কারণ ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আবেষ্টন করে তার সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে, তা আক্বীদাহ্-বিশ্বাস হোক কিংবা ইবাদত-উপাসনা হোক, আদর্শ-চরিত্র হোক, পার্থিব কিংবা আধ্যাত্মিক হোক।

আর এই বই যেটি আমি ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (র) কর্তৃক রচিত ‘যাদুল মা‘আদ ফী হাদীয়ে খাইরিল ইবাদ’ গ্রন্থ হতে সংকলন করেছি, যেটি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শমালা সম্পর্কে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনন্য-অতুলনীয়, যা মূলত তাঁর জীবনাদর্শমালাকে বিশ্ব মানবতার সামনে ফুটিয়ে তোলার একটি প্রয়াস মাত্র; যাতে আমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি এবং তাঁর আদর্শে আদর্শবান হতে পারি। আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন: তিনি যেন ইখলাস বা তাঁর জন্য একনিষ্ঠতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করেন এবং এ কিতাবে বরকত দান করেন।”

ড. আহমাদ ইবন উসমান আল-মাযইয়াদ

Dr.almazyad@gmail.com

(১) পবিত্রতা অর্জন ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরণ করা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[1]

(ক) প্রাকৃতিক প্রযোজনপূর্ণ করার সময় তাঁর আদর্শমালা :

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় প্রবেশকালে বলতেন :

«اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»

'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু-বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাব-ইস।'

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অপবিত্র নর জ্বিন ও অপবিত্র নারী জ্বিন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[2]

আর পায়খানা হতে বর্হিগমন কালে বলতেন:

(غفرانك)

'গোফরানাকা'

"হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"[3]

২. তিনি অধিকাংশ সময় বসে প্রস্রাব করতেন।

---

[1] যাদুল মাআদ : ১/১৬৩।

[2] বুখারী ও মুসলিম।

[3] আবু দাউদ, তিরমিযী।

৩. তিনি কখনো পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতেন, আবার কখনো পাথর দিয়ে কুলুখ করতেন, আবার কখনো কুলুখ ও পানি উভয়টি ব্যবহার করতেন।

৪. তিনি ইস্তিঞ্জা ও কুলুখ বাম হাত দিয়ে সম্পাদন করতেন।

৫. তিনি পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা শেষে হাত মাটিতে ঘষে ধৌত করে নিতেন।

৬. তিনি সফরকালে প্রস্রাব-পায়খানায় যাওয়ার সময় সাথীদের থেকে অনেক দূরে চলে যেতেন, যাতে কেউ দেখতে না পায়।

৭. এই উদ্দেশ্যে তিনি কোনো বস্তুর আড়ালে গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন, কখনো খেঁজুর শাখার বৃক্ষরাজী দ্বারা, আবার কখনো উপত্যকার কোনো বৃক্ষ দ্বারা।

৮. তিনি প্রস্রাবের সময় নরম জায়গা বা বালুকাময় ভূমি চয়ন করতেন।

৯. তিনি প্রস্রাব-পায়খানার জন্য বসার আগেই কাপড় উঠাতেন না।

১০. তিনি প্রস্রাব করার সময় কেউ সালাম করলে উত্তর দিতেন না।”

(খ) অযু করার সময় তাঁর আদর্শমালা :[4]

১. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় প্রত্যেক সালাতের জন্য অযু করতেন, আবার কখনো এক অযু দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন।

২. তিনি কখনো এক মুদ[5] পানি দ্বারা অযু করতেন, আবার কখনো মুদের দুই-তৃতীয়াংশ দ্বারা, আবার কখনো মুদের চেয়ে বেশী পানি দ্বারা।

৩. তিনি অযু করার সময় সর্বাধিক কম পানি ব্যবহার করতেন এবং স্বীয় উম্মতকে পানি অপব্যয় করা হতে সতর্ক করতেন।

৪. তিনি অযুর অঙ্গগুলো এক-একবার, দু'-দু'বার ও তিন-তিনবার ধৌত করতেন, আবার কোনো অঙ্গ দু'বার ও অন্য অঙ্গ তিনবার ধৌত করেন, তবে কখনই তিন বারের অধিক ধৌত করেননি।

৫. তিনি 'মাযমাযা'- (তথা কুলি করা ও 'ইস্তিনশাক্ব'-তথা নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার) করা কখনো এক চিলু পানি দ্বারা সম্পাদন করতেন, আবার কখনো দুই চিলু পানি দ্বারা, আবার কখনো তিন

---

[4] যাদুল মা'আদ : ১/১৮৪

[5] অর্থাৎ, এক সা'-এর এক-চতুর্থাংশ, কম-বেশী-৭৫০ মিঃলিঃ পরিমান।" অনুবাদক

চিলু পানি দ্বারা করতেন, বস্তুত তিনি ‘মাযমাযা’ ও ‘ইস্তিনশাক্ব’ লাগাতার করতেন।

৬. তিনি ডান হাতে নাকে পানি দিয়ে বাম হাত দ্বারা নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করতেন।

৭. তিনি যখনই অযু করতেন তখনই ‘মাযমাযা’ ও ‘ইস্তিনশাক্ব’ করতেন।

৮. তিনি সমগ্র মাথা (একবার) মাসেহ করতেন, আবার কখনো স্বীয় হস্তদ্বয় মাথার অগ্রভাগে রেখে পিছন পর্যন্ত নিয়ে যেতেন এবং পুনরায় পিছন থেকে উভয় হাত অগ্রভাগে টেনে আনতেন।

৯. তিনি মাথার শুধু অগ্রভাগ মাসেহ করলে তখন বাকী অংশ পাগড়ীর উপর মাসেহ করে সম্পূর্ণ করতেন।

১০. তিনি মাথার সাথে স্বীয় কানদ্বয়ের ভিতর ও বাহিরের অংশ মাসেহ্ করতেন।

১১. তিনি স্বীয় পাদ্বয় (গোড়ালি পর্যন্ত) ধৌত করতেন, যখন তাতে চামড়া কিংবা সুতার মোজা না হতো।

১২. তিনি অযুর কার্যাবলী লাগাতার ও ধারাবাহিকতার সাথে সম্পন্ন করতেন, এতে কখনই বিঘ্ন বা ভিন্নতা সৃষ্টি করেন নি।

১৩. তিনি ‘বিসমিল্লাহ্’ বলে অযু শুরু করতেন এবং অযু শেষে বলতেন:

5أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،

اللّٰهُمَّ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين4

আশ-হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ও রাসুলুহু; আল্লা-হুম্মাজ‘আলনী মিনাত-তাওয়াবীনা, ওয়াজ‘আলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন।”[6]

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোনো মা‘বুদ নেই, তিনি এক ও একক, তাঁর কোনো শরীক বা অংশীদার নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ ! আমাকে তাওবাহকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।”

তিনি আরো বলতেন:

(سبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)

সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্ল-আনতা, আস্তাগফিরুকা, ওয়াআতুবু- ইলাইক।”

---

[6] তিরমিযী

“হে আল্লাহ ! তুমি পাক-পবিত্র, তোমারই প্রশংসা, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া সত্য কোনো মা‘বুদ বা উপাস্য নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার নিকট তাওবাহ করি।

১৪. তিনি অযুর শুরুতে ‘নাওয়্যাইতু রাফআল হাদাস’ কিংবা ‘নাওয়্যাইতু ইসতেবাহতুস সালাত’ ইত্যাদি গদবাঁধা শব্দ পাঠ করে নিয়্যাত করেননি, তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ কখনই এমনটি করেননি[7]।

১৫. তিনি কখনই কনুইদ্বয় ও গোড়ালিদ্বয়ের উপর ধৌত করেননি।

১৬. অযু শেষে অঙ্গগুলি মুছে শুকানো তাঁর অভ্যাস ছিল না।

১৭. তিনি কখনো দাঁড়ির ভিতরে পানি দিয়ে দাঁড়ি খেলাল করতেন, কিন্তু তা নিয়মিত সব সময় করেননি।

১৮. তিনি হাত ধোয়ার সময় এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ভরে দিয়ে খেলাল করতেন, কিন্তু তা নিয়মিত সব সময় করেননি।

১৯. অযু করার সময় সর্বদা অন্যে পানি ঢেলে দেওয়া তাঁর নীতি ছিল না, কিন্তু কখনো তিনি নিজেই পানি ঢেলে অযু করতেন, আবার কখনো প্রয়োজন বিশেষ তাঁর সাহাবীদের কেউ পানি ঢেলে দিতেন।”

---

[7] বরং নিয়্যাত হলো অন্তরে পবিত্রতা অর্জনের সংকল্প করা।” অনুবাদক।

(গ) মোজার উপর মাসেহ করা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[8]:

১. সহীহ্ সনদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি সফরকালে এবং গৃহে অবস্থানকালে মোজার উপর মাসেহ করেছেন এবং মুকিম (মুসাফির নয় এমন) ব্যক্তির জন্যে একদিন একরাত, আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত মাসেহ করার সময় সীমা নির্ধারণ করেন।

২. তিনি খুফ্ তথা চামড়ার তৈরী মোজার উপরের ভাগে মাসেহ করতেন এবং 'জাওরাব' তথা সুতা বা পশমী মোজার উপরও মাসেহ করেন, তিনি শুধু পাগড়ীর উপরও মাসেহ করেন, আবার কখনো মাথার অগ্রভাগ মাসেহ করে বাকী অংশ পাগড়ীর উপর সম্পূর্ণ করেন।

৩. তিনি বিনা প্রয়োজনে (মোজা পরিধান কিংবা খোলার মাধ্যমে) অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতেন না, বরং পাদ্বয়ে মোজা থাকলে মাসেহ করতেন, নচেৎ পাদ্বয় ধৌত করতেন।"

(ঘ) তায়াম্মুমে তাঁর আদর্শমালা [9]:

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মাটি দ্বারা যার উপর সালাত আদায় করা যায়, তায়াম্মুম করতেন, তা মাটি হোক

---

[8] যাদুল মাআদ : ১/১৯২

[9] যাদুল মাআদ : ১/১৯২

কিংবা গন্ধকযুক্ত ভুমি হোক অথবা বালুকাময় ভুমি হোক, আর বলতেন :

“যেখানেই আমার উম্মতের কারো সালাতের সময় উপস্থিত হবে, সেখানেই তার সালাত আদায় করার স্থান ও পবিত্রতা অর্জন করার বস্তু বিদ্যমান রয়েছে।”[10]

২. তিনি দূর-দূরান্ত সফরের সময় সাথে মাটি বহন করে নিতেন না এবং এর আদেশও করেননি।

৩. তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য তায়াম্মুম করেননি এবং এর নির্দেশও দেননি, বরং তায়াম্মুমের বিধানকে ব্যাপক করত অযুর বিধানের স্থালাভিষিক্ত করেছেন।

৪. তিনি মুখমণ্ডল, কব্জিদ্বয়ের জন্য যমীনে একবার হাত মেরে তায়াম্মুম করতেন।

---

[10] মসনাদে ইমাম আহমাদ।

(২) সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালার বিবরণ[11]

(ক) সানা পাঠ ও কেরাআত প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:

১. যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন, তখন তিনি 'তাকবীর'-আল্লাহু আকবার' বলে সালাত শুরু করতেন এর পূর্বে কিছুই পাঠ করতেন না এবং তিনি কখনই নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করেননি।

২. তিনি তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় স্বীয় দু'হাতের আঙ্গুলগুলো সোজা করে তালু ক্বিবলামুখী অবস্থান দু'কানের লতি বরাবর কিংবা কাঁধ বরাবর উঠাতেন, অতঃপর ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর রাখতেন।

৩. তিনি কখনো নিম্নোক্ত দু'আটি দ্বারা ইসতেফতাহ্ পাঠ করতেন:

(اللّٰهُمَّ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللّٰهُمَّ نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللّٰهُمَّ اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)

'আল্লা-হুম্মা বা-'য়িদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া, কামা-বা- 'আদতা বাইনাল্ মাশারিক্বি ওয়াল মাগরিবি। আল্লা-হুম্মা নাক্বিনী মিনায যুনুবি ওয়াল খাত্বা-ইয়া, কামা ইউনাক্বাস্ সাওবুল আবইয়াদু মিনাদ্ দানাস।

---

[11] যাদুল মা'আদ: ১/১৯৪

আল্লা-হুম্মাগসিলনী মিন খাত্বা-ইয়া-ইয়া, বিলমা-য়ি ওয়াস্ -সালজি ওয়াল-বরদি।”[12]

“হে আল্লাহ ! তুমি আমার ও আমার গুনাহ্ -খাতার মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি কর যেমনটি দুরত্ব সৃষ্টি করোছো পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ ! আমার পাপ ও ভূলক্রুটিসমূহ হতে আমাকে এমনভাবে পরিষ্কার ও পবিত্র কর যেমনভাবে সাদা বস্ত্র ময়লা হতে পরিস্কার করা হয়। হে আল্লাহ ! আমার যাবতীয় পাপ ও ক্রুটি-বিচ্যূতিগুলো পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।”

আবার কখনো তিনি নিম্নোক্ত দু‘আটি পাঠ করতেন:

(وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين)

‘অজ্জাহতু অজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস্ সামা-ওয়াতি অলআরযা হানীফাউ অয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন, ইন্না স্বালাতী, ওয়া নুসুকী, ওয়া মাহয়্য-য়্যা, ওয়া মামাতী, লিল্লাহী রাব্বিল আ’-লামীন, লা-লামীন, লা-শারিকালাহু ওয়া বিযা-লিকা উমিরতু, ওয়া আনা আওয়ালুল মুসলিমীন’

[12] বুখারী ও মুসলিম।

“আমি সেই মহান সত্তার দিকে একনিষ্টভাবে আমার মুখ ফিরাচ্ছি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী তথা যাবতীয় ইবাদত, আমার জীবন এবং আমার মরণ একমাত্র সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য, তাঁর কোনো শরীক-অংশীদার নেই, আর এরই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।”[13]

৪. তিনি ইসতিফতাহ এর দু‘আ পাঠ করার পর ‘আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বোনির রাজীম-বলে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।

৫. তিনি সালাতে দু’বার সেক্তা বা বাকরুদ্ধ বা নিশ্চুপ থাকতেন, একবার তাকবীরে তাহরীমা ও কেরাতের মধ্যখানে, বস্তুত: দ্বিতীয়টি সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে, কোনো কোন বর্ণনায় তা ছিল সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর, অন্য বর্ণনায় রয়েছে তা ছিল রুকুর পূর্বে।

৬. তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর আরো একটি সূরা পাঠ করতেন। কখনো কেরাত লম্বা করতেন, আবার কখনো সফর বা অন্যকোনো বিশেষ কারণে কেরাত হাল্কা করতেন, তবে তিনি অধিকাংশ সময়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন।

৭. তিনি ফজরের সালাতে প্রায় ষাট আয়াত, এমনকি একশত আয়াত পাঠ করতেন। তিনি ফজরের সালাত সূরা ‘ক্ব-ফ’ দ্বারা

---

[13] মুসলিম

পড়েন এবং সূরা 'আর-রূম' দ্বারা, আবার সূরা 'আত-তাকওয়ীর" দ্বারাও পড়েন। তিনি ফজরের উভয় রাকয়াতে সূরা যিলযাল পাঠ করেন। তিনি সফরকালে ফজরের সালাত 'মোয়াউযাতাইন'-সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস দ্বারা পড়েন। একদা তিনি ফজরের সালাতে সূরা আল-মু'মিনুন পাঠ আরম্ভ করেন, অতঃপর প্রথম রাকায়াতে মূসা ও হারূন আলাইহিস সালাম এর ঘটনা পর্যন্ত পৌঁছলে তাঁর কাশি আসে, তখন তিনি রুকু করে ফেলেন।

৮. তিনি জুম'আর দিন ফজরের সালাত 'আলিফ-লাম-মীম সাজদাহ্ ও আদ-দাহর' সূরাদ্বয় দ্বারা পড়তেন।

৯. তিনি যুহরের সালাতে কখনো কেরাত লম্বা করতেন, পক্ষান্তরে আসরের সালাত যুহরের কেরাতের অর্ধেক হতো যদি তা লম্বা হয়ে থাকে, আবার সেই অনুপাতে সংক্ষিপ্ত হতো।

১০. তিনি মাগরিবের সালাত একবার সূরা 'আত-তূর' দ্বারা আদায় করেন, আরেকবার সূরা 'আল মুরাসালাত' দ্বারা।

১১. এশার সালাতে তিনি সূরা 'আত-তীন' পাঠ করেন এবং তিনি মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর জন্য এশার সালাতে সূরা 'আশ-শামস' ও সূরা 'আল-আ'লা' এবং সূরা 'আল-লাইল' অথবা অনুরূপ সূরাসমূহ পাঠ করা নির্ধারিত করে দিয়েছেন, আর মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক এশার সালাতে সূরা বাক্বারা পাঠ প্রসঙ্গে অসম্মতি প্রকাশ করেছেন।

১২. তাঁর আদর্শ ছিল এক রাকাতে পূর্ণ সূরা পাঠ করা, আবার অনেক সময়ে তিনি এক সূরা দু'রাকাআতে পূর্ণ করতেন, আবার অনেক সময় তিনি সূরায় প্রথমাংশ পাঠ করতেন, কিন্তু (ফরয সালাতে) সূরার শেষাংশ কিংবা মধ্যমাংশ থেকে পাঠ করতেন বলে বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। দুই সূরা এক রাকাআতে পাঠ করা তা নফল সালাতে করতেন। তিনি কোনো নির্দিষ্ট সালাতের জন্য কোনো সূরা এমনভাবে নির্দিষ্ট করতেন না যে ঐ সূরা সেই সালাতেই পড়তে হবে, একমাত্র জুম'আ ও দুই ঈদের সালাত ব্যতীত।

১৩. তিনি ফজরের সালাতে এক মাস পর্যন্ত রুকুর পরে দু'আ কুনুত পড়েছিলেন, অতঃপর তা পরিত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁর এ কুনুত পাঠ কারণবশত ছিল।[14] অতঃপর উক্ত কারণ শেষ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট হুকুমও নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে তাঁর আদর্শ ছিল বিশেষ বিপদাপদের সময় কুনুতে নাযিলাহ্ পাঠ করা, কিন্তু তা ফজরের সালাতের সাথে নির্দিষ্ট ছিল না।

(খ) সালাতের পদ্ধতি প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:[15]

---

[14] অর্থাৎ 'রাআল'-'যাকাওয়ান' গোত্রদ্বয়ের লোকেরা বি'রে মা'উনার নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করে সত্তর জন সাহাবীকে হত্যা করলে তাদের উপর বদ-দো'আস্বরূপ এক মাস পর্যন্ত তিনি কুনূতে নাযিলাহ্ পাঠ করেন। অনুবাদক।

[15] যাদুল মা'আদ : ১/২০৮।

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সালাতের প্রথম রাকাতকে দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা দীর্ঘায়িত করতেন।

২. তিনি কেরাত পাঠ শেষে শ্বাস ফিরে আসা পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকতেন। অতঃপর উভয় হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকু করতেন এবং দু'টো হাত দিয়ে হাঁটু দু'টো ধারণকারীর ন্যায় আঁকড়ে ধরতেন এবং উভয় হাত পাঁজর থেকে তীরের রশির মতো সোজা করে রাখতেন এবং পিঠটা টেনে সোজা রাখতেন, বস্তুত মাথাটা উঁচু করতেন না এবং খুব নিচুও করতেন না, বরং কোমর ও পিঠের বরাবর রাখতেন।

৩. তিনি রুকুতে কখনো বলতেন,

(سبحان ربي العظيم)

"সুব্‌হা-না রাব্বিয়াল 'আযীম।"[16]

"আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।"

আবার কখনো বলতেন:

(سبحانك اللّٰهُمَّ ربنا وبحمدك، اللّٰهُمَّ اغفر لي)

---

[16] মুসলিম

‘সুব্হানাকা আল্লা-হুম্মা, রাববানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী।’[17]

“হে আমাদের রব আল্লাহ ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।”

আবার কখনো বলতেন:

(سبوح قدوس رب الملائكة والروح)

‘সুব্বু-হুন কুদ্দুসুন রাববুল আলাইকাতি ওয়াররুহ।’[18]

“সকল ফিরিশতা ও জিবরাইলের প্রতিপালক অত্যন্ত পবিত্র।”

৪. সাধারণত তাঁর রুকু-সিজদাহগুলো দশবার তাসবিহ্ পাঠ করার সমপরিমাণ লম্বা হতো, তবে কখনো রুকু-সিজদাহ্ ক্বিয়ামের সমপরিমাণ দীর্ঘায়িত করতেন, কিন্তু তা শুধুমাত্র ‘সালাতুল লাইল’ বা রাত্রিকালীন সালাত তাহাজ্জুদে করতেন, নচেৎ অধিকাংশ সময় তাঁর নীতি ছিল যে, সমন্বয় ও সুষ্ঠুরুপে সালাত আদায় করা।

৫. তিনি

(سمع الله لمن حمده)

---

[17] বুখারী, মুসলিম।

[18] মুসলিম,

‘সামিআল্লা-হু লিমান হামিদা’

“যে তাঁর (আল্লাহর) প্রশংসা করেছে আল্লাহ তার সে প্রশংসা শুনেছেন।”

এ কথা বলে স্বীয় মাথা উঠাতেন।”[19] তখন উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং স্বীয় পিঠ সোজা করতেন, অনুরূপ যখন তিনি স্বীয় মাথা সিজদাহ্ হতে উত্তোলন করে পিঠ সোজা করতেন, আর সতর্ক করে বলতেন: “যে ব্যক্তি রুকু-সিজদায় তার পিঠ সোজা করে না, তার সালাতই হয় না।”[20]

তিনি রুকু থেকে সোজা হয়ে উঠার পর বলতেন:

(ربنا ولك الحمد)

‘রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ।’

“হে আমাদের রব! তোমারই জন্যে সকল প্রশংসা।”

আবার অনেক সময়ে বলতেন: *‘রাব্বানা লাকাল হামদ।’*

আবার অনেক সময়ে বলতেন: *‘আল্লা-হুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ।’*

---

[19] বুখারী

[20] সুনানে তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ।

৬. তিনি এই ক্বিয়ামের রুকনকে রুকুর সমপরিমাণ দীর্ঘায়িত করতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন।

(اللّٰهُمَّ ربنا ولك الحمد، ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعدُ، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللّٰهُمَّ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)

'আল্লা-হুম্মা রাব্বানা, ওয়া-লাকাল হামদ্, মিলআসসামা-ওয়াতি ওয়া মিলআল আরদ্বি, ওয়া মিলআ মা-শি'তা মিন্ শাইয়িন বা'দু। আহলাস সানা-য়ি ওয়াল মাজদ, আহাক্কু মা-ক্বালাল আব্দু, ওয়া কুল্লুনা লাকা আব্দু; আল্লা-হুম্মা লা-মানি'আ লিমা আ'ত্বাইতা ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা য়্যানফা'উ যাল-জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।'[21]

"হে আল্লাহ আমাদের রব! তোমার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আকাশমণ্ডলী ভর্ত্তি করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং যা এই দু'য়ের মধ্যবর্তী মহাশূন্যকে পরিপূর্ণ করে দেয়, আর এগুলি ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তাও পূর্ণ করে দেয়, হে প্রশংসা ও গৌরবের অধিকারী ! বান্দার সবচেয়ে সত্যকথা, বস্তুত: আমরা সকলই তোমার বান্দা। হে আল্লাহ ! তুমি যা প্রদান কর তা রোধ করার এবং যা তুমি রোধ কর তা প্রদান করার সাধ্য কারো নেই, আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোনো উপকারে আসবে না।

[21] মুসলিম

৭. অতঃপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় যেতেন এবং তখন হাতদ্বয় উপরে উঠাতেন না। তখন প্রথমে হাঁটুদ্বয় তারপর উভয় হাত, অতঃপর কপাল ও নাক মাটিতে রাখতেন, তিনি কপাল ও নাকের উপর সিজদা করতেন, পাগড়ীর প্যাচের উপর নয়। তিনি বেশী বেশী যমীনের উপর এবং পানিযুক্ত কাদামাটির উপর সিজদা করতেন এবং খেজুরের পাতা দ্বারা বানানো চাটাই ও পাকা চামড়ার বিছানার উপর সিজদা করতেন।

৮. তিনি সিজদা অবস্থায় স্বীয় কপাল ও নাক পুরোভাবে যমীনে রাখতেন এবং উভয় হাত যমীন থেকে উপরে উঠিয়ে শরীরের দু'পার্শ্ব হতে পৃথক করে ব্যবধানে রাখতেন, ফলে বগলের সাদা অংশ পর্যন্ত দেখা যেতো।

৯. তিনি সিজদায় স্বীয় হাত কাঁধ বরাবর কিংবা দু'কানের লতি বরাবর রাখতেন এবং সিজদায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন পাদ্বয়ের আঙ্গুলগুলো ক্বিবলামুখী করে রাখতেন, দু'হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলো মাটিতে বিছিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতেন, খোলে কিংবা গুছিয়ে রাখতেন না।

১০. তিনি কখনো বলতেন:

(سبحانك اللّٰهُمَّ ربنا وبحمدك، اللّٰهُمَّ اغفر لي)

‘সুবহানাকা আল্লা-হুম্মা, রাববানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী।’[22]

“হে আমাদের রব আল্লাহ ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।”

আবার কখনো বলতেন:

(سبوح قدوس رب الملائكة والروح)

‘সুব্বু-হুন কুদ্দুসুন রাববুল আলাইকাতি ওয়াররুহ।’[23]

১১. সিজদার দু‘আ পাঠ শেষে তিনি ‘আল্লাহু আকবার’ বলে হাত উত্তোলন না করে মাথা উঠাতেন। অতঃপর সোজা হয়ে বাম-পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন, উভয় হাত উভয় উরুর উপর রেখে উভয় কনুই উভয় উরু বরাবর উপরে রাখতেন, আর ডান হাত হাঁটু সংলগ্ন অংশের উপর রেখে কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল দু’টো মুঠো করে এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধ আঙ্গুল দু’টোর মাথা এক জায়গায় করে শাহাদাত আঙ্গুলটি উপরে তুলে ইশারা ও নড়াচড়া করে বলতেন:

(اللّٰهُمَّ اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني)

---

22 বুখারী, মুসলিম।

23 মুসলিম,

‘আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ার-হামনী, ওয়াজ-বুরনী, ওয়াহ-দিনী, ওয়া‘আ-ফিনী, ওয়ার- যুক্বনী।’[24]

“হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর, আমার প্রয়োজন মিটাও, আমাকে হেদায়াত দাও, আমাকে নিরাপত্তা দান কর এবং আমাকে রিজেক্ব দাও।

১২. তাঁর আদর্শ ছিল এ রুকন তথা দু'সেজদার মাঝখানের বসাটাকে সেজদার সমপরিমাণ দীর্ঘায়িত করা।

১৩. অতঃপর তিনি উভয় উরুর উপর ভর দিয়ে পাদ্বয়ের প্রথমাংশের উপর (দ্বিতীয় রাকাতের জন্যে) সোজা দাঁড়াতেন, আর দাঁড়ানোর সাথে সাথে কেরাত পাঠ আরম্ভ করতেন এবং প্রথম রাকাতের ন্যায় দু‘আ ইস্তিফতাহ পাঠ করার জন্য নিশ্চুপ থাকতেন না। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাত প্রথম রাকাতের ন্যায় আদায় করতেন শুধু চারটি বিষয় ব্যতীত, এক. তাকবীরে তাহরীমার পর নিশ্চুপ থাকা, দুই. দু‘আ ইসতিফতা পাঠ করা, তিন. তাকবীরে তাহরীমা, চার. প্রথম রাকাতকে দীর্ঘায়িত করা।

তিনি প্রথম রাকাতকে দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা লম্বা করতেন, আবার অনেক সময়ে তিনি প্রকাম রাকাত ততক্ষণ দীর্ঘায়িত করতেন,

---

[24] আবু দাউদ, তিরমিযী,ইবনে মাজাহ্

যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো আগন্তক ব্যক্তির পায়ের আওয়াজ আর শুনতেন না।

১৪. তিনি যখন তাশাহহুদের জন্য বসতেন, তখন ডান-হাত ডান-উরুর উপর এবং বাম হাত বাম-উরুর উপর রেখে তর্জনী বা শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন, বস্তুত তখন শাহাদাত আঙ্গুলটি সোজা খাড়া কিংবা একেবারে বিছিয়ে রাখতেন না, বরং সামান্য ঝুঁকিয়ে রাখতেন, আর কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল দু'টো মুঠো করে এবং মাধ্যমা ও বৃদ্ধ আঙ্গুল দুটোর মাথা এক জায়গায় করে শাহাদাত আঙ্গুলটি উত্তোলন করে তাশাহহুদ পাঠ করতেন এবং তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন।

১৫. তিনি এ বৈঠকে সর্বদা আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন এবং সাহাবীদেরকে তা শিক্ষা দিতেন:

(التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)

‘আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্-স্বালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যেবা-তু, আস্-সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু ওয়া-রাহমাতুল্লাহ-হি ওয়া-বারাকাতুহ, আস্-সালামু আলাইনা ওয়া-‘আলা ইবাদিল্লাহিস্ স্বালিহীন,

আশ্‌হাদু আল-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু, ওয়া-আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।”[25]

“যাবতীয় সাদর-সম্ভাষণ, যাবতীয় সালাত, যাবতীয় পবিত্র ইবাদত খালেসভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। হে নবী ! আপনার উপর সকল প্রকার শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর ও আল্লাহর সকল নেক বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।”

তিনি এই বৈঠক খুবই সংক্ষেপ করতেন, যেন তিনি কোনো উত্তপ্ত পাথরের উপর বসে সালাত আদায় করছেন।

অতঃপর তিনি ‘আল্লাহু আকবার’ বলে উভয় উরুর উপর ভর দিয়ে উভয় পায়ের প্রথমাংশের উপর (তৃতীয় রাকাতের জন্যে) সোজা দাঁড়াতেন এবং স্বীয় হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন, আবার অনেক সময় শেষ দু’রাকাতে সূরা ফাতিহার পর কুরআনের কিছু অংশ পড়তেন।

১৬. তিনি শেষ তাশাহহুদে তাওয়াররুক করে বসতেন, “তিনি পাছাকে যমীনে ভর করে বসে স্বীয় পা এক দিকে বের করে

---

[25] বুখারী।

দিতেন।”-[26], আর বাম পাকে ডান উরু ও পিন্ডলীর নিচ দিয়ে ডান দিকে বের করে দিয়ে ডান পা খাড়া করে রাখতেন, আবার কখনো ডান -পা বিছিয়ে রাখতেন, তখন ডান-হাত ডান-উরুর উপর করে তর্জনী বা শাহাদাত আঙ্গুলটি খাড়া করে রাখতেন, তিনি সালাতের শেষাংশে এ দু‘আ দ্বারা প্রার্থনা করতেন

(اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللَّهُمَّ وأعوذ بك من المأثم والمغرم)

‘আল্লা-হুম্মা ইন্নি আ‘উযুবিকা মিন্ ‘আযাবিল্-ক্বাবরী, ওয়া- ‘আউযুবিকা মিন্ ফিত্নাতিল মাসীহিদ-দাজ্জালি, ওয়া- ‘আউযুবিকা মিন্ ফিত্নাতিল মাহইয়া-য়া ওয়া ফিত্নাতিল্ মামা-ত, আল্লা-হুম্মা ইন্নী ‘আউযুবিকা মিনাল্ মা’সামি ওয়াল-মাগরাম।’[27]

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আরো দাজ্জালের ফিত্না থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, আর আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার জীবনের বিপর্যয় এবং মৃত্যুর যাতনা হতে, হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সমস্ত গুনাহ ও সব রকমের ঋণের দায় হতে।”

---

[26] সুনানে আবু দাউদ

[27] বুখারী।

অতঃপর ‘আস্-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ বলে ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরাতেন।

১৭. তিনি মুসল্লিকে সূতরা নিতে বলতেন, যদিও তীর ধনুক কিংবা লাঠি দ্বারা হয়। সফরকালে ও মাঠে-ময়দানে তাঁর জন্যে সুতরাস্বরূপ বর্শা গেড়ে রাখা হতো, তিনি তার দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। কখনও তিনি স্বীয় সাওয়ারীকে চওড়াভাবে রেখে সে দিকে সালাত আদায় করতেন। কখনও তিনি পাল্কি হাত দ্বারা সোজা করে তার শেষ প্রান্তের কাঠের দিকে ফিরে সালাত পড়তেন।

১৮. তিনি দেওয়ালের দিকে ফিরে সালাত আদায় করলে তাঁর ও দেওয়ালের মাঝখানে একটি বকরী যাতায়াতের পথ বাকী থাকতো। তিনি সুতরা থেকে দূরত্বে দাঁড়াতেন না, বরং সুতরার নিকটবর্তী হতে নির্দেশ দিতেন।”

(গ) নামাযের অবস্থায় তাঁর আদর্শমালা:[28]

১. সালাতের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকানো তাঁর আদর্শ ছিল না।

২. সালাতের মধ্যে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করা তাঁর নীতি ছিল না।

৩. তিনি সালাত পড়ার সময় স্বীয় মাথা একটু নিচু করে রাখতেন। তিনি সালাত লম্বা করার ইচ্ছায় আরম্ভ করতেন, কিন্তু শিশুর কান্না

---

[28] যাদুল মা‘আদ : ১/২৪১

শুনে তার মায়ের উপর কঠিন হওয়ার ভয়ে তা সংক্ষেপে করে ফেলতেন।

৪. তিনি কখনো তাঁর নাতনী উমামা বিনতে যায়নাবকে কাঁধে বহন করে ফরয সালাত আদায় করতেন, যখন রুকু-সেজদায় যেতেন তখন তাকে কাঁধ থেকে রেখে দিতেন, আবার যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে কাঁধে বহন করে নিতেন।

৫. তিনি সালাতরত অবস্থায় কখনো হাসান কিংবা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এসে তাঁর পিঠে সাওয়ার হতো, তখন পিঠ থেকে পড়ে যাওয়াকে অপছন্দ করায় তিনি সেজদা দীর্ঘায়িত করতেন।

৬. তিনি সালাত আদায় করতেন, তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বাহির থেকে এলে হেঁটে গিয়ে তাঁর জন্য দরজা খুলে দিতেন, অতঃপর স্বীয় মুসল্লায় ফিরে আসতেন।

৭. তিনি সালাতরত অবস্থায় হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দিতেন।

৮. তিনি সালাতরত অবস্থায় ফুঁক দিতেন এবং (আল্লাহর ভয়ে) স্বশব্দে ক্রন্দন করতেন এবং প্রয়োজনে গলা পরিস্কার করতেন।

৯. তিনি কখনো খালি পায়ে সালাত পড়তেন, আবার কখনো জুতা পরিহিত অবস্থায়। ইয়াহূদীদের বিরোধিতার লক্ষ্যে কখনো জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন।

১০. তিনি কখনো এক কাপড়ে সালাত আদায় করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ সময় তিনি দুটি কাপড়ে সালাত পড়তেন।

(ঘ) সালাত শেষে তাঁর আদর্শমালা:[29]

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের পর তিনিবার বলতেন: আস্তাগফিরুল্লাহ্, অর্থাৎ "আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" অতঃপর বলতেন

(اللّٰهُمَّ أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام)

'আল্লা-হুম্মা আন্তাস্ সালামু ওয়া-মিনকাস্ সালামু তাবা-রাক্তা ইয়া-যাল্জালা-লি ওয়াল-ইকরাম।"[30]

"হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমা হতেই শান্তি উৎসারিত হয়, তুমি বরকতময় হে মহত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী।"

তিনি উক্ত দু'আ দু'টি কিবলামুখী পড়ে তাড়াতাড়ি ডান কিংবা বাম দিক দিয়ে ঘুরে মুক্তাদীগণের মুখোমুখি হয়ে বসতেন।

২. তিনি "ফজরের সালাত আদায় করে সালাতের স্থানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন।"[31]

---

[29] যাদুল মা'আদ : ১/২৮৫

[30] মুসলিম।

৩. তিনি প্রত্যেক ফরয সালাত শেষে নিম্নোক্ত দু'আগুলো পাঠ করতেন,

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمدُ وهو على كل شيء قدير. اللّٰهُمَّ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إلٰه إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إلٰه إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু,লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লা-হুম্মা লা-মানিয়া লিমা আ'অতাইতা ওয়ালা মুআ'তিয়া লিমা মানা'আতা, ওয়ালা ইয়ানফায়ু যালজাদ্দি মিনকাল্ জাদ্দু।"-সহীহ বুখারী, লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লা-হ। লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু, ওয়ালা নাবুদু ইল্লা ইয়্যাহু, লাহুননে'আমাতু ওয়ালাহুল ফাযলু ওয়ালাহুস সানাউল হাসান। লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু, মুখলিস্বীনা লাহুদ্দীন, ওয়ালাও কারিহাল কা-ফিরূন।'[32]

"আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোনো মা'বুদ নেই, তিনি এক ও একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, সমগ্র রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ ! তুমি যা দিয়েছ তা রোধ করার কেউ নেই, আর যা তুমি রোধ করেছ তা দান করার সাধ্য

---

[31] তিরমিযী

[32] মুসলিম।

কারো নেই, আর ধনবানের ধন তোমার আযাবের মুকাবিলায় কোনো উপকার করতে পারে না। অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎকাজ করার কারো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোনো মা'বুদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, সকল নে'আমত ও সকল অনুগ্রহ তাঁরই, আর তাঁরই সকল সুন্দর গুণগান। আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোনো মা'বুদ নেই, আমরা তাঁর ইবাদতের জন্যই নিবেদিত, যদিও তা কাফেরদের নিকট অপছন্দনীয়।"

৪. তিনি স্বীয় উম্মতকে প্রত্যেক ফরয সালাত শেষে 'সুবহানাল্লাহ্' ৩৩ বার, আল-হামদু লিল্লাহ' ৩৩ বার এবং 'আল্লাহু আকবার' ৩৩ বার পাঠ করে

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمدُ وهو على كل شيء قدير)

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, ১ বার পড়ে মোট ১০০ বার পূর্ণ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।"

(ঙ) নফল ও রাত্রিকালীন সালাত প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[33]:

[33] যাদুল মা'আদ : ১/৩১১।

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত সালাত ও সাধারণ নফল সালাতসমূহ সাধারণত স্বগৃহে আদায় করতেন, বিশেষ করে মাগরিবের সুন্নাত।

২. তিনি মুক্বিম অবস্থায় সর্বদা দশ রাকাত সালাত নিয়মিত পড়তেন, যোহরের পূর্বে দুই রাকাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, এশার পর ঘরে এসে দুই রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত।

৩. তিনি সকল নফল সালাত হতে ফজরের সুন্নাতের প্রতি সর্বাধিক তৎপর ছিলেন। তিনি ফজরের সুন্নাত এবং বিতরের সালাত কখনই ছাড়েন নি, সফর অবস্থায়ও না আর মুক্বিম অবস্থায়ও না, আর তাঁর থেকে সফরকালীন অবস্থায় এই দু’টি সালাত ছাড়া অন্য কোনো নিয়মিত নফল সালাত পড়া প্রমাণিত নেই।

৪. তিনি ফজরের সুন্নাত পড়ে ডান কাতে শুইতেন।

৫. তিনি কখনো কখনো যোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়তেন। একদা যোহরের পরের দু’রাকাত ছুটে গেলে আসরের পর তা আদায় করেন।

৬. তিনি অধিকাংশ সময়ে তাহাজ্জুদের সালাত দাঁড়ানো অবস্থায় আদায় করতেন, আবার অনেক সময় বসে বসে আদায় করেন, আবার কখনো বসে বসে কেরাত পড়তেন, সামান্য কেরাত অবশিষ্ট থাকতে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় রুকু করতেন।

৭. তিনি তাহাজ্জুদের সালাত আট রাকাত পড়তেন এবং প্রত্যেক দু'রাকাতের পর সালাম ফিরাতেন। অতঃপর তিনি একটানা পাঁচ রাকাতে বিতিরের সালাত পড়তেন এবং সর্বশেষে শুধু একবার বসতেন, অথবা নয় রাকাতে বিতির পড়তেন এভাবে যে, আট রাকাত একটানা পড়ার পর বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম না ফিরিয়ে আবার উঠে এক রাকাত পড়ে বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফিরাতেন, পরন্তু বিতরের সালামের পর আরো দু'রাকাত পড়তেন, কিংবা উক্ত নয় রাকাতের ন্যায় সাত রাকাতে বিতর পড়তেন, অতঃপর আরো দু'রাকাত বসে পড়তেন।

৮. তিনি রাতের প্রথমাংশে, মধ্যমাংশে ও শেষাংশে বিতরের সালাত আদায় করেন। তিনি ইরশাদ করেন যে, তোমরা তোমাদের রাত্রিকালীন সালাতের শেষাংশ বিতর করো।"[34]।

৯. তিনি বিতরের পর দু'রাকাত কখনো বসা অবস্থায় পড়তেন, আবার কখনো উক্ত দু রাকাতে বসা অবস্থায় কেরাত পাঠ করার পর রুকু করার ইচ্ছা করলে খাড়া হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় রুকু করতেন।

১০. তিনি ঘুমিয়ে পড়া কিংবা অসুখের কারণে তাঁর রাত্রিকালীন সালাত-তাহাজ্জুদ ছুটে গেলে তিনি দিনে (দুপুর হওয়ার পূর্বে ১১ রাকাতের পরিবর্তে) ১২ রাকাত সালাত আদায় করতেন।

---

[34] বুখারী ও মুসলিম।

১১. তিনি কোনো এক রাতে তাহাজ্জুদে একটি আয়াত {সূরা মায়েদার **১১৮** নং আয়াতটি} তিলাওয়াত করেন এবং সেটি সকাল পর্যন্ত বারংবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন।"[35]

১২. তিনি রাত্রিকালীন সালাতে কখনো নিম্নঃস্বরে, আবার কখনো উচ্চঃস্বরে কুরআন পাঠ করতেন, আর ক্বিয়াম কখনো লম্বা, আবার কখনো সংক্ষিপ্ত করতেন।

১৩. তিনি বিতিরের সালাতে 'সূরাতুল আ'লা ও সূরা 'কাফিরূন' এবং সূরা 'ইখলাস' পাঠ করতেন, যখন সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার বলতেন:

(سبحان الملك القدوس)

'সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দুস, -তৃতীয়বারে তিনি এই শব্দগুলো একটু বেশী টেনে উচ্চঃস্বরে বলতেন।"[36]

[35] ইবন মাজাহ।

[36] আবু দাউদ, নাসাঈ।

(৩) জুম‘আহ্‌ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[37]:

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শ ছিল জুম‘আর দিনকে বড় মনে করা ও মর্যাদাবান জ্ঞান করা এবং কতিপয় বৈশিষ্টাবলী সেই দিনের জন্যে নির্ধারণ করা। তন্মধ্যে জুম‘আর দিনে গোসল করা, সবচেয়ে উত্তম কাপড় পরিধান করা, ইমামের খুৎবা মনোযোগ সহকারে ওয়াজিব মনে করে শ্রবণ করা।

২. লোক সমবেত হয়ে গেলে তিনি মসজিদে প্রবেশ করে উপস্থিত সবাইকে সালাম দিতেন, তারপর মিম্বরে উঠে লোকদের মুখী হয়ে সালাম করতেন, তারপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করে বসতেন, তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আযান শুরু করতেন, আযান শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তিনি খুৎবা আরম্ভ করতেন এবং আযান ও খুতবার মধ্যে কোনো কালক্ষেপন করতেন না। তাঁর জন্যে মিম্বর তৈরী করার পূর্বে তিনি ধনুক কিংবা লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবা দিতেন।

৩. তিনি সর্বদা মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন, অতঃপর সামান্য বসে পুনরায় উঠে দ্বিতীয় খুৎবা দিতেন।

৪. তিনি লোকদেরকে তাঁর নিকটবর্তী হয়ে নীরবে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন, ‘যে ব্যক্তি খুৎবার সময় তার সাথীকে বললো: তুমি চুপ থাক! সেই ব্যক্তিও

---

[37] যাদুল মা‘আদ: ১/৩৫৩।

অর্থহীন কাজ করলো, আর যে কেউ তখন অর্থহীন কাজ করল তার জুম‘আ বিনষ্ট হয়ে গেল।”

৫. খুৎবা দেওয়ার সময় তাঁর চোখ দু’টি লাল হয়ে যেতো, স্বর উচ্চ হতো এবং তাঁর রাগভাব খুব বেড়ে যেতো, মনে হতো যেন তিনি কোনো সৈন্য বাহিনীকে হামলার ভয় প্রদর্শণকারী।

৬. তিনি খুৎবায়, ‘আম্মা বা‘দু’ বলতেন এবং খুৎবা সংক্ষিপ্ত, আর সালাত লম্বা করতেন।

৭. তিনি খুৎবায় সাহাবীদেরকে ইসলামী নীতিমালা, শরীয়াতের বিধি-বিধানসমূহ শিক্ষা দিতেন এবং উপস্থিত প্রয়োজন অনুযায়ী আদেশ-নিষেধ করতেন।

৮. তিনি উপস্থিত প্রয়োজনে কিংবা কারো প্রশ্নের উত্তর দানের উদ্দেশ্যে খুৎবা বন্ধ করে দিতেন, প্রয়োজন সেরে পুনরায় খুৎবা সমাপ্ত করতেন, প্রয়োজনে কখনো তিনি মিম্বর থেকে নেমে প্রয়োজন সেরে পুনরায় মিম্বরে ফিরে যেতেন। তিনি উপস্থিত চাহিদা অনুযায়ী বক্তব্য রাখতেন, তিনি সেখানে কোনো ক্ষুধার্ত কিংবা অভাবগ্রস্থ লোক দেখলে তাদেরকে দান-সদকা করার নির্দেশ দিতেন এবং সে জন্যে উৎসাহিত করতেন।

৯. তিনি খুৎবায় আল্লাহর নাম উচ্চারণকালে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। অনাবৃষ্টির কারণে অভাব দেখা দিলে তিনি খুৎবায় বৃষ্টির জন্য দু‘আ করতেন।

১০. তিনি জুম‘আর সালাত শেষে ঘরে গিয়ে দু’রাকাত সুন্নাত পড়তেন, আর যারা মসজিদে আদায় করতেন তাদেরকে চার রাকাত পড়ার নির্দেশ দিতেন।”

(৪) দুই ঈদের সালাতে তাঁর আদর্শমালা[38]

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের সালাত সর্বদা ঈদগাহে আদায় করতেন এবং সবচেয়ে সুন্দর কাপড় পরিধান করে সুসজ্জিত হতেন।

২. তিনি ঈদুল ফিতরের দিন সকালে ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বে বেজোড় সংখ্যায় খেজুর খেতেন, পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিন সকালে ঈদগাহ থেকে আসা পর্যন্ত কিছু খেতেন না, বরং ঈদগাহ থেকে ফিরে এসে কুরবানীর গোস্ত খেতেন। তিনি ঈদুল ফিতরের সালাত একটু বিলম্বে, আর ঈদুল আযহার সালাত সকাল সকালে আদায় করতেন।

৩. তিনি ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যেতেন এবং তাঁর আগে একটি বর্শা উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো, ঈদগাহে পৌঁছার পর তা সুতরাস্বরূপ তাঁর সামনে স্থাপন করা হতো, যাতে তিনি তার দিকে ফিরে সালাত আদায় করেন।

৪. তিনি ঈদগাহে পৌঁছে আযান-ইক্বামত ছাড়াই ঈদের সালাত শুরু করতেন, এমনকি 'সালাত শুরু হলো' এ কথাটিও বলতেন না, ঈদগাহে পৌঁছে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ ঈদের সালাতের পূর্বে কিংবা পরে কোনো সালাত পড়তেন না।

---

[38] যাদুল মা'আদ: ১/৪২৫।

৫. তিনি খুৎবার পূর্বে ঈদের দু'রাকাত সালাত পড়তেন, প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে তাকবীরে তাহরীমাহ্ সহ লাগাতার সাতটি তাকবীর দিতেন, প্রতি দুই তাকবীরের মাঝে সামান্য একটু চুপ থাকতেন, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট দু'আ পড়তেন বলে কোনো বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাকবীর শেষে কেরাত আরম্ভ করতেন এবং কেরাত শেষে তাকবীর বলে রুকু করতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে লাগাতার আরো পাঁচটি তাকবীর দিতেন, তারপর কেরাত পাঠ করে যথাযথ নিয়মে সালাত সম্পন্ন করে মানুষের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন, এ অবস্থায় মানুষেরা নিজ-নিজ কাতারে বসে থাকতো তিনি তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত ও আদেশ-নিষেধ করতেন। তিনি প্রথম রাকাতে সূরা ক্বাফ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ক্বামার পড়তেন, আবার কখনো প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা গাশীয়াহ্ পাঠ করতেন।

৬. তিনি যমীনে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন এবং সেখানে কোনো মিম্বর ছিল না। ৭. তিনি খুৎবা শোনার জন্যে না বসারও অনুমতি দেন। আর পবিত্র ঈদ যদি জুম'আর দিনে হয়, তাহলে ঈদের সালাত জুম'আর জন্য যথেষ্ট হবে বলেন। অর্থাৎ সেদিন জুমআর সালাতের পরিবর্তে যোহরের সালাত আদায় করলে যথেষ্ট হবে তিনি ঘোষণা করেন।

৮. তিনি ঈদের দিন রাস্তা পরিবর্তন করে এক রাস্তায় ঈদগাহে যেতেন এবং অপর রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরে আসতেন।

(৫) সূর্য গ্রহণ কালে তাঁর আদর্শমালা[39]

১. যখন একবার সূর্য গ্রহণ হলো তখন তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাড়াহুড়ো করে স্বীয় চাদর টানতে টানতে মসজিদের দিকে বের হন এবং অগ্রসর হয়ে লোকদের নিয়ে দু'রাকাত সালাত পড়লেন, তারপর খুব লম্বা করে রুকু করলেন, অতঃপর রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করলেন তখন বললেন: 'সামিআল্লা-হু লিমান হামিদা' 'রাববানা ওয়া-লাকাল হামদ'। অতঃপর আবার ক্বেরাত শুরু করেন এবং এরপর পুনরায় রুকু করলেন, তবে এই রুকু তুলনামুলকভাবে প্রথম রুকুর চাইতে হাল্কা ছিল, তারপর রুকু থেকে মাথা উঠালেন, অতঃপর লম্বা সিজদা করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাতে তাই করলেন যা প্রথম রাকাতে করেছিলেন। তাই প্রত্যেক রাকাতে দুই রুকু ও দুই সিজদা ছিল। অতঃপর সালাত শেষে তিনি গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চতর ভাষাসম্পন্ন খুৎবা প্রদান করলেন।

২. তিনি সূর্য গ্রহণের সময় আল্লাহর যিকর-সালাত ও আল্লাহ নিকট দু'আ-ইসতিগফার, দান-খায়রাত এবং গোলাম আযাদ করার নির্দেশ প্রদান করেন।"

---

[39] যাদুল মা'আদ : ১/৪৩৩।

(৬) ইস্তেস্কা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[40]

১ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবার সময় মিম্বরের উপর ইস্তিসকা, অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন। জুমআর দিন ছাড়াও তিনি ইস্তিসকা করেন, একদা তিনি মসজিদে নববীতে বসা অবস্থায় দু'হাত উত্তোলন এবং মহান আল্লাহর নিকট ইস্তিস্কা বা বৃষ্টি প্রার্থনা করেন।

২. ইস্তিসকার সময় নিম্নোক্ত কতিপয় দু'আ পাঠ করা তাঁর থেকে প্রমাণিত রয়েছে:

(اللَّهُمَّ اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت)

'আল্লা-হুম্মাসকি ইবা-দাকা, ওয়া বাহাইমাকা, ওয়ানশুর রাহমাতাকা, ওয়া আহয়ী বালাদাকাল মাইয়্যেত।'

"হে আল্লাহ ! তুমি তোমার বান্দাদেরকে এবং জীব-জন্তুদেরকে পানি পান করাও, আর তোমার রহমত ছড়িয়ে দাও এবং তোমার মৃত শহরকে সজীব কর।

তিনি আরো বলতেন:

(اللَّهُمَّ اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلاً غير آجل)

---

40 যাদুল মা'আদ : ১/৪৩৯।

'আল্লা-হুম্মাসকিনা গাইছাম-মুগীছান, মুরীআন, না-ফিআন-গায়রা যা-ররিন, 'আ-জিলান-গায়রা আ-জিলিন।'[41]

"হে আল্লাহ ! তুমি আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি পান করাও যা ফরিয়াদ দূরকারী, পিপাসা নিবারণকারী, সাচ্ছন্দ্য প্রদানকারী, শষ্য-ফসল উৎপাদনকারী, উপকারী-অপকারী নয়, শীঘ্রই, বিলম্বে নয়।"

৩. তিনি যখন মেঘ ও বাতাসের প্রচণ্ডতা দেখতেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডলে ভয়-বিষণ্ণতা দেখা যেতো, তবে বৃষ্টি বর্ষণ শেষ হয়ে গেলে তা দূর হয়ে যেতো।

৪. তিনি বৃষ্টির সময়ে এ দু'আটি বলতেন :

(اللَّهُمَّ صيباً نافعاً)

'আল্লা-হুম্মা সাইয়্যাবান না-ফি'আন।'[42]

"হে আল্লাহ! মুসলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও।"

আর তিনি শরীরের কাপড় খুলে দিতেন, যাতে বৃষ্টির ফোটা গায়ে পড়ে, এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বলেন: বৃষ্টি তার প্রভুর নিকট হতে নবাগত।"[43]

---

[41] আবুদাউদ।

[42] বুখারী ও মুসলিম।

৫. সাহাবীগণ তাঁর নিকট অতি বৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি বৃষ্টি বন্ধের জন্যে দু‘আ করে বলেন:

(اللّٰهُمَّ حوالينا ولا علينا، اللّٰهُمَّ على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر)

‘আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লাইনা ওয়ালা ‘আলাইনা, আল্লা-হুম্মা ‘আলাল-আ-কামে, ওয়ায-যিরাবে, ওয়া বুতুনিল-আওদিয়াতে, ওয়া মানা-বিতিশ শাজারে।’[44]

“হে আল্লাহ! আমাদের আশে-পাশে বর্ষণ কর, আমাদের উপর নয়, হে আল্লাহ! টিলা-পাহাড়, নদী-নালা, খাল-বিল, বন-জঙ্গল এবং বৃক্ষ উৎপাদনের জায়গায় বৃষ্টি বর্ষণ কর।”

---

[43] মুসলিম।

[44] বুখারী ও মুসলিম।

(৭) সালাতুল খাওফ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[45]

১. সালাতুল খাওফ বা যুদ্ধ ও ভয়-ভীতির সময়কার সালাত প্রসঙ্গে তাঁর নীতিমালা ছিল যে, শত্রু সেনাদল যদি তাঁর মাঝে ও ক্বিবলার মাঝে অবস্থান করে থাকে, তবে তিনি মুসলিম সৈন্যদেরকে তাঁর পিছনে দু'কাতারে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে সালাতের জন্য তাকবীর বলতেন এবং তাঁরাও তাকবীর বলে সালাত শুরু করতো, অতঃপর তাঁরা সবাই রুকু করতেন এবং একসাথে রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, অতঃপর প্রথম কাতারের সেনাদল সিজদায় যেতো এবং দ্বিতীয় কাতারের সেনাদল শত্রু সৈন্যদের মুখোমুখি দণ্ডায়মান হতো, আর যখন তিনি দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াতেন, তখন পিছন কাতারের সেনাদল দু'টি সিজদা করে দাঁড়িয়ে প্রথম কাতারের স্থানে অগ্রসর হতো এবং প্রথম কাতারের সেনাদল দ্বিতীয় কাতারে চলে যেতো, এভাবে সবাই প্রথম কাতারের ফযিলত অর্জন করত এবং দ্বিতীয় কাতারের সেনাদল তাঁর সাথে দ্বিতীয় রাকাতের সিজদায় যেতেন, (সেটার বিস্তারিত রূপ হচ্ছে,) সুতরাং দ্বিতীয় রাকাতের রুকু থেকে দাঁড়ানোর পর উভয় দল তাই করতো যা প্রথম রাকাতে করেছিল, অতঃপর যখন তিনি তাশাহহুদের জন্য বসতেন, তখন পিছনের কাতারের সেনাদল দুটি সিজদা করে তাঁর সাথে তাশাহহুদে মিলিত হতো, আর সবাই এক সাথে সালাম ফিরাতো।

[45] যাদুল-মা'আদ : ১/৫১০।

২. শত্রু সেনাদল ক্বিবলা ছাড়া অন্য কোনো দিকে অবস্থান করলে, তখন তিনি কখনো মুসলিম সেনাদলকে দু'ভাগ করে একভাগকে শত্রু সৈন্যদলের মুখোমুখি করতেন এবং অপর ভাগকে নিয়ে তিনি সালাতে দাঁড়াতেন, তখন এই দল তাঁর সাথে এক রাকাত সালাত আদায় করার পর শত্রু সৈন্যদের মুখোমুখি অবস্থানরত দলের নিকট চলে যেতো এবং শত্রু সৈন্যদের সম্মুখে দন্ডায়মান হতো, অতঃপর দ্বিতীয় দলটি এসে তাঁর সাথে সালাতে শরীক হয়ে এক রাকাত আদায় করতো, অতঃপর তিনি সালাম ফিরালে প্রত্যেক দলই ইমামের সালামের পর নিজে নিজে এক রাকাত পড়ে সালাত পূর্ণ করতো।

৩. আবার কখনো তিনি একদলকে নিয়ে এক রাকাত পড়ার পর যখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াতেন, তখন এ দলটি তাদের দ্বিতীয় রাকাত পূর্ণ করে তাঁর রুকুর পূর্বেই সালাম ফিরাতো, অতঃপর দ্বিতীয় দল এসে তাঁর সাথে অপর রাকাত পড়তো, অতঃপর তিনি যখন তাশাহহুদের জন্য বসতেন, তখন এ দলটি দাঁড়িয়ে তাদের অপর রাকাত পূর্ণ করতো, আর তিনি তাশাহহুদে তাদের অপেক্ষা করতেন, পরন্তু এই দলটি তাশাহহুদ পাঠ করার পর তাদেরকে সাথে নিয়ে সালাম ফিরাতেন।

৪. আবার কখনো তিনি একদলকে নিয়ে সালাম ফিরাতেন, অতঃপর দ্বিতীয় দলকে নিয়ে আবার দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরাতেন।

৫. আবার কখনো এক দলকে নিয়ে এক রাকাত পড়তেন এবং এ দল চলে যেতো এবং সালাত পূর্ণ করতো না, অতঃপর দ্বিতীয় দলটি এসে তাঁর সাথে এক রাকাত পড়তো এবং সালাত পূর্ণ করতো না, এভাবে তিনি দু'রাকাত পড়তেন, কিন্তু তারা এক এক রাকাত আদায় করতো।"

(৮) মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[46]

১. মৃতব্যক্তির কাফন-দাফন প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ছিল সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ এবং অন্যান্য জাতির নীতিমালা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং মৃতব্যক্তির প্রতি তার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-পরিজনের দয়া-অনুগ্রহের সর্বোত্তম নিদর্শন; যার প্রথমে ছিল অসুস্থতার সময় তাকে দেখা-শোনা করা, পরকালীন জীবনের সুখ-শান্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং তাকে ওসীয়্যাত ও তাওবা করার জন্য উৎসাহিত করা। আর উপস্থিত লোকদের নির্দেশ প্রদান করা তারা যেন তাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্যবাণীর তালক্বীন করে থাকে, যাতে উক্তবাণী তার সর্বশেষ কথা হয়।

২. তিনি ছিলেন আল্লাহর ফায়সালার উপর সৃষ্টির সর্বাধিক সন্তুষ্ট এবং সর্বাধিক তাঁর প্রশংসাকারী, তিনি ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যুতে দয়াপরশ হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে ক্রন্দন করেন, কিন্তু তাঁর অন্তর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শোকরে পরিপূর্ণ এবং যবান মুবারাক আল্লাহর যিকর ও প্রশংসায় মাশগুল ছিল। তিনি বলেন: "চক্ষু অশ্রুসিক্ত এবং অন্তর দুঃখিত, কিন্তু মুখে শুধু এমন কথাই বলব, যাতে প্রভু হন সন্তুষ্ট।"[47]

---

[46] যাদুল মা'আদ: ১/৪৭৯।

[47] বুখারী ও মুসলিম।

৩. জাহিলী যুগের অনুসরণে গাল চিরে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ও চিৎকারে করে মৃত্যের জন্য বিলাপ করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

৪. তাঁর আদর্শ ছিল মাইয়্যেতের কাফন-দাফনে তাড়াহুড়া করা, মাইয়্যেতকে পরিষ্কার-পবিত্র করা এবং সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া।

৫. তাঁর আদর্শ ছিল মাইয়্যেতের মুখমণ্ডল ও শরীর ঢেকে দেওয়া এবং চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দেওয়া।

৬. তিনি কখনো কখনো মাইয়্যেতকে চুমু দিতেন।

৭. তিনি মাইয়্যেতকে তিনবার, পাঁচবার, প্রয়োজনবোধে আরো বেশীবার ধৌত করার এবং শেষ বারে তার গায়ে কর্পুর কিংবা কর্পুর জাতীয় কোনো সুগন্ধ বস্তু ছিটিয়ে দিতে আদেশ করেন।

৮. তিনি যুদ্ধে নিহত শহীদকে গোসল দিতেন না এবং তাঁদের থেকে চামড়ার নির্মিত বস্তু ও লোহা জাতীয় জিনিসগুলো খোলে নিতেন, আর তাঁদেরকে রক্তমাখা কাপড়-চোপড়সহ দাফন করতেন এবং তাঁদের উপর জানাযার সালাত কখনও পড়েননি।

৯. হজ্জ-ওমরার ইহরামকারী ব্যক্তিকে কুল পাতা মিশানো পানি দ্বারা গোসল দিতে এবং তার ইহরামের কাপড় দ্বারা কাফন দিতে নির্দেশ দেন, আর তাকে কোনো সুগন্ধি বস্তু স্পর্শ করানো এবং তার মাথা চাদর দ্বারা ঢেকে দিতে নিষেধ করেন।

১০. তিনি মৃতের অভিভাবককে সুন্দর ও সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং কাফনে বেশী দামী কাপড় ব্যবহার করতে বারণ করেন।

১১. তাঁর আদর্শ ছিল যদি কাফন ছোট-খাট হতো, যাদ্বারা মাইয়্যেতের সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করা যেতো না, তাহলে তিনি তার মাথা ঢেকে পায়ের দিকে কিছু তাজা ঘাস রেখে দিতেন।”

(ক) জানাযার সালাত প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:[48]

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের বাহিরে মাইয়্যেতের উপর জানাযার সালাত আদায় করতেন, আবার কখনো মসজিদের ভিতর জানাযার সালাত পড়েন, কিন্তু তা তাঁর নিয়মিত আদর্শ ছিল না।

২. যখন তাঁর কাছে কোনো মাইয়্যেত আনা হতো, তখন তিনি তার ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন।”[49] তার উপর কোনো ঋণ না থাকলে জানাযার সালাত পড়তেন, নচেৎ তিনি নিজে তার উপর জানাযার সালাত পড়তেন না, সাহাবীদেরকে পড়ার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর আল্লাহ্ যখন তাঁকে বিজয়ী করেন, তখন তিনি ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির উপর জানাযার সালাত পড়েন এবং নিজেই তার ঋণ

---

[48] যাদুল মা‘আদ: ১/৪৮৫।

[49] বুখারী, মুসলিম।

পরিশোধ করতেন, আর তার পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে দিতেন।

৩. তিনি যখন জানাযার সালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর দিতেন তারপর আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করতেন এবং দু'আ করতেন, আর তিনি চার তাকবীর দ্বারা জানাযার সালাত আদায় করতেন, তবে কখনো কখনো পাঁচ তাকবীর দেন।

৪. তিনি মাইয়্যেতের জন্য নিষ্ঠার সাথে দু'আ করার নির্দেশ দেন এবং তাঁর থেকে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ সংরক্ষিত আছে:

(اللّٰهُمَّ اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللّٰهُمَّ من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللّٰهُمَّ لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده).

'আল্লা-হুম্মাগফির লিহাইয়িনা ওয়ামায়্যিতিনা, ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা, ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা, ওয়া যাকারিনা ওযা উনসানা, আল্লা-হুম্মা মান্ আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহী 'আলাল ইসলাম, ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু 'আলাল ঈমান, আল্লা-হুম্মা লা-তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তাফতিন্না-বা'আদাহ।'[50]

"হে আল্লাহ! আমাদের জীবতি ও মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, আর আমাদের ছোট-বড় এবং আমাদের নর-নারী সবাইকে ক্ষমা করে

[50] তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ।

দাও, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্য হতে যাকে তুমি জীবিত রাখতে চাও, তাকে তুমি ইসলামের উপর জীবিত রাখো, আর যাকে তুমি মৃত্যু দিতে চাও, তাকে তুমি ঈমানের উপর মৃত্যু দাও, হে আল্লাহ্! এই মাইয়্যেতের প্রতিদান থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না এবং এর পরে আমাদের ফেতনায় লিপ্ত করো না।

(اللّٰهُمَّ اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله خيراً من داره وأهلاً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار)

‘আল্লা-হুম্মাগফির লাহু, ওয়ারহামহু, ওয়া আ-ফিহী, ওয়া‘ফু আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু, ওয়া ওয়াসসি‘ মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিলমা-য়ি ওয়াস্ সালাজি ওয়াল বারাদি, ওয়া নাককিহী মিনাল খাতায়া কামা-নাক্কাইতাস্ সাওবাল্ আব্ইয়াদ্বা মিনাদ-দানাস, ওয়া আবদিলহু দারান্ খাইরাম মিন্ দা-রিহী ওয়া আহলান্ খাইরাম মিন্ আহলিহী, ওয়া যাওজান্ খাইরান মিন্ যাওজিহী, ওয়া আদ্ খিলহুল জান্নাতা, ওয়া আ‘য়িযহু মিন্ আযাবিল ক্বাবরি ওয়া মিন্ আযাবিন্ না-র।’[51]

“হে আল্লাহ্ তুমি তাকে মাফ কর, তার উপর রহম কর, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখ, তাকে ক্ষমা কর, মর্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা কর, তার বাসস্থান প্রশস্ত করে দাও, তুমি তাকে ধৌত কর পানি,

---

[51] মুসলিম।

বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিষ্কার কর যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়, আর তার পার্থিব ঘরের চেয়ে তুমি তাকে একটি উত্তম ঘর দান কর এবং তার পরিবারের বদলে এক উত্তম পরিবার এবং জোড়ার চেয়ে এক উত্তম জোড়া দান কর, আর তাকে তুমি জান্নাতে দাখিল কর এবং কবরের আযাব ও জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে তাকে মুক্তি দাও।

৫. তিনি পুরুষ লাশের মাথা বরাবর এবং মহিলা লাশের মাঝ বরাবর দাঁড়াতেন।

৬. তিনি নাবালেগ শিশুর উপর জানাযার সালাত পড়তেন, আর তিনি আত্মহত্যাকারী এবং গনীতমের মালে খেয়ানতকারীর উপর জানাযার সালাত পড়তেন না।

৭. তিনি জুহানিয়্যাহ গোত্রের সেই মহিলার উপর জানাযার সালাত পড়েন, যার উপর তিনি ব্যভিচারের দণ্ডবিধি প্রয়োগ করেছিলেন।

৮. তিনি বাদশাহ নাজাশীর উপর গায়েবী জানাযা পড়েন, কিন্তু প্রত্যেক মাইয়্যেতের উপর গায়েবী জানাযা পড়া তাঁর আদর্শ ছিল না।

৯. তাঁর আদর্শ ছিল কারো উপর জানাযার সালাত ছুটে গেলে, তিনি তা তার কবরের উপর আদায় করতেন।”

(খ) দাফন ও তার সংশ্লিষ্ঠ বিষয়াদি প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[52]

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযা শেষে লাশের আগে-আগে পাঁয়ে হেঁটে গোরস্থান পর্যন্ত যেতেন এবং যানবাহনে আরোহণকারীদের জন্য লাশের পিছনে থাকা সুন্নাত করেন, আর পাঁয়ে হেঁটে গমনকারীগণ যেন লাশের নিকটে থাকে সামনে কিংবা পিছনে, ডানে কিংবা বামে এবং লাশ বহন করে তাড়াতাড়ি চলার নির্দেশ দেন।

২. তিনি বসতেন না যতক্ষণ না যমীনে লাশ রাখা হতো।

৩. তিনি জানাযার সম্মানার্থে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন, কিন্তু বসে থাকাও তাঁর থেকে সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত আছে।

৪. তাঁর আদর্শ ছিল সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত এবং ঠিক দুপরের সময় মাইয়্যেত দাফন না করা।

৫. তাঁর আদর্শ ছিল কবর লাহদ করা, কবর গভীর করা এবং মাইয়্যেতের মাথা ও পাঁদ্বয় বরাবর কবরকে প্রশস্ত করা।

৬. তিনি দাফন শেষে মাইয়েতের উপর তার মাথার দিক থেকে তিনবার মাটি নিক্ষেপ করতেন।

---

[52] যাদুল মা'আদ: ১/৪৯৮

৭. তিনি মাইয়্যেত দাফন শেষে তার কবরের উপর দাঁড়িয়ে সাওয়াল-জওয়াবে সাবিত থাকার জন্য দু'আ করেন এবং সাহাবীগণকে এ বিষয়ে নির্দেশ দেন।"[53]

৮. তিনি কবরের উপর বসে (কুরআনুল কারীম হতে) কিছু পাঠ করতেন না, আর না মাইয়্যেতকে সাওয়াল-জওয়াব শিক্ষা দিতেন।

৯. তাঁর আদর্শ ছিল মাইয়্যেতের জন্য চিৎকার করে কান্নাকাটি না করা, বরং তিনি তা থেকে কঠোরভাবে বারণ করতেন।"

(গ) কবর ও শোকবার্তা বা সান্তনা প্রদান প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[54]

১. তাঁর আদর্শ ছিল না কবরসমূহ উঁচু করা, তার উপর ঘর তৈরী করা, পাথর-ইট ইত্যাদি দিয়ে গম্বুজের মত তৈরী করা।

২. তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে ইয়ামেন দেশে প্রেরণ করেন, যাতে সকল মুর্তি ভেঙ্গে চুর্ণ বিচুর্ণ করে ফেলেন এবং উঁচু কবরকে ভেঙ্গে সমান করে দেন। অতএব তাঁর আদর্শ হলো উঁচু কবরকে ভেঙ্গে সমান করে দেওয়া।

৩. তিনি কবর চুনা করা, কবরের উপর ঘর তৈরী করা এবং কবরের উপর নাম-ঠিকানা লিখে রাখতে নিষেধ করেন।

---

[53] আবু দাউদ।

[54] যাদুল মা'আদ : ১/৫০৪।

৪. যে কবরের পরিচয় রাখতে চায়, তিনি তার উপর একটুকরা পাথর রেখে দিতে বলতেন।

৫. তিনি কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করা এবং এসব কর্মে লিপ্ত লোকদের প্রতি অভিসম্পাত করেন।

৬. তাঁর আদর্শ ছিল কবরসমূহ অপমানিত বা পদদলিত না করা, কবরের উপর না বসা এবং তার উপর ঠেস না লাগানো এবং কবরকে মহৎ কিছু মনে না করা।

৭. তিনি সাহাবীদের কবর যিয়ারত করতেন, তাদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করার লক্ষ্যে, আর কবর যিয়ারতকারীর জন্য এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত করেন:

(السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)

'আস্-সালামু আলাইকুম আহলাদ-দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীন, ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লাহু বিকুম লাহিকুন, নাছ্আলুল্লাহ লা-না ওয়া লাকুমুল 'আফিয়াহ।'[55]

"হে কবরের অধিবাসী মু'মিন-মুসলিমগণ! তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, আর আমরাও ইন-শা-আল্লাহ্ তোমাদের সাথে মিলিত

[55] মুসলিম।

হবো, আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।”

৮. তাঁর আদর্শ ছিল মাইয়্যেতের শোকার্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়া, কিন্তু সান্ত্বনা প্রদানের জন্য একত্রিত হওয়া এবং মাইয়্যেতের জন্য কবরের পার্শ্বে কিংবা অন্য কোথাও কুরআনখানী করা তাঁর আদর্শ ছিল না।

৯. তাঁর আদর্শ ছিল মাইয়্যেতের পরিবার যেন লোকদের খাবারের আয়োজনের কষ্ট না করে, বরং তিনি লোকদের নির্দেশ প্রদান করেন: তারা যেন মাইয়্যেতের শোকার্ত পরিবারের জন্য খাবারের আয়োজন করে।”

(৯) যাকাত ও দান-সদকা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালার বিবরণ[56]

(ক) যাকাত প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা: -

১. যাকাতের সময়-সীমা, পরিমাণ ও নেসাব এবং যাকাত কার উপর ফরয হবে এবং যাকাতের হকদার কারা? এসব বিষয়ে তাঁর আদর্শমালা সর্বাধিক পুর্ণাঙ্গ। যাতে ধনী-দরিদ্র উভয়ের কল্যাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে এবং ধনীদের সম্পদে সেই পরিমাণ যাকাত ফরয করা হয়েছে যদ্বারা ফকীরের প্রয়োজন পূরণ হয়, কারো প্রতি অবিচার করা ছাড়া।

২. যখন তিনি কোনো ব্যক্তিকে যাকাতের হকদার বলে জ্ঞাত হতেন, তখন তাকে যাকাতের মাল থেকে প্রদান করতেন, আর অপরিচিত কোনো ব্যক্তি যার অবস্থা সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত নন তাঁর নিকট যাকাতের মাল চাইলে, তিনি তাকে এ কথা বলার পর প্রদান করতেন যে, যাকাতের মালে ধনী ও সক্ষম উপার্জনকারী ব্যক্তির কোনো অংশ নেই।

৩. তাঁর আদর্শ ছিল যাকাতের মাল ধনীদের থেকে সংগ্রহ করে সে দেশের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা, অতঃপর কিছু অতিরিক্ত হলে তাঁর নিকট মদীনায় নিয়ে আসলে তিনি তা বন্টন করে দিতেন।

---

[56] যাদুল মা'আদ : ২/৫।

৪. তিনি শুধু প্রকাশ্য মাল যথা চতুস্পদ জন্তু ও জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের যাকাত সংগ্রহ করার জন্যে দূত প্রেরণ করতেন।

৫. তিনি উৎপাদিত শস্যের অনুমান করার জন্যে লোক প্রেরণ করতেন, যিনি খেজুর বাগানের খেজুর ও আঙ্গুরের লতায় আঙ্গুর অনুমান করতো, অতঃপর কত ওসক্ক হবে[57] অনুমান করে সেই পরিমান যাকাত নির্ধারণ করতো।

৬. তাঁর আদর্শ ছিল না ঘোড়া-গাধা, খচ্চর এবং ক্রীতদাসের যাকাত গ্রহণ করা, অনুরূপ সব্জী, ফল-ফসলাদি যেগুলো তোলা-ওজন করা হয় না এবং গুদামজাত করা হয় না, কিন্তু তিনি আঙ্গুর ও পাকা খেজুরের যাকাত সংগ্রহ করতেন, তা তাজা হোক কিংবা শুষ্ক হোক এতে কোনো পার্থক্য করেন নি।

৭. তাঁর আদর্শ ছিল না মানুষের উত্তম-উত্তম মালগুলো যাকাত হিসেবে নিয়ে নেওয়া, বরং তিনি মধ্যম মাল গ্রহণ করতেন।

৮. তিনি সদকা গ্রহণকারী ফকীরকে তার সদকা বিক্রয় করতে নিষেধ করতেন, কিন্তু ধনীর জন্য সদকার মাল ভক্ষণ করা জায়েয করেন যদি ফকীর তাকে তা হাদিয়্যাস্বরূপ প্রদান করে থাকে।

---

[57] ১ ওসক্ক = ৬০ নববী সা', আর ১ সা' = প্রায় আড়াই কেজি, সুতরাং ৫ ওসক্ক = ৭৫০ কেজি নেসাব পূর্ণ হলে।" অনুবাদক

৯. তিনি কখনো মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার্থে সদকার মাল থেকে পরিশোধ করার শর্তে ঋণ গ্রহণ করতেন, আবার কখনো সদকার মাল থেকে পরিশোধ করার শর্তে ঋণ গ্রহণ করতেন, আবার কখনো সদকার মাল তার মালিকদের নিকট হতে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতেন।

১০. কোনো ব্যক্তি যাকাতের মাল নিয়ে এলে তিনি তার জন্য এ বলে দু'আ করতেন: হে আল্লাহ ! তার এবং তার উটের মধ্যে বরকত দান কর।"[58]

আবার কখনো বলতেন :

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ)

'হে আল্লাহ ! তুমি তার প্রতি সালাত পেশ কর।"[59]

(খ) যাকাতুল ফিৎরা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:[60]

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সা' করে খেজুর, যব, পনির ও কিশমিশ হতে সদকায়ে ফিৎরা আদায় করা ফরয করেন[61]।

---

[58] সুনানে নাসাঈ।

[59] বুখারী ও মুসলিম।

[60] যাদুল মা'আদ : ২/১৮।

২. তাঁর আদর্শ ছিল সদকায়ে ফিৎর ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করা। তিনি ঘোষণা করেন: “যে কেউ তা ঈদের সালাতের আগে আদায় করে তা হবে মাক্ববুল যাকাতুল ফিৎর, আর যে কেউ তা সালাতের পরে আদায় করে, তা হবে শুধুমাত্র এক প্রকার দান-খায়রাত।”[62]

৩. তাঁর আদর্শ ছিল সদকাতুল ফিৎর বিশেষভাবে অভাবগ্রস্তদের মাঝে বন্টন করা, অর্থাৎ তিনি তা যাকাতের হকদার আট প্রকারের উপর বন্টন করেন নি।

(গ) নফল সদকা-খায়রাত প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:[63]

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মালিকানায় মানুষের মাঝে সর্বাধিক দানশীল ছিলেন, তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত নে‘আমতে সন্তুষ্ট হয়ে অধিক কামনা করতেন না এবং আল্লাহ প্রদত্ত নে‘আমতকে নগণ্য মনে করতেন না।

২. কেউ তাঁর নিকট কোনো কিছু চাইলে, তিনি তাকে তা প্রদান করতেন কম হোক কিংবা বেশী হোক।

৩. তিনি দান করে দানগ্রহণকারী অপেক্ষা অধিক খুশী হতেন।

---

61 নববী সা‘ = প্রায় আড়াই কেজি।” অনুবাদক।

62 আবু দাউদ।

63 যাদুল মা‘আদ : ২/২১।

৪. তিনি কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি দেখলে তাকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতেন, কখনো স্বীয় খাদ্যদ্রব্য প্রদান করে, আবার কখনো স্বীয় পোষাক প্রদান করে।

৫. তাঁর উদারতা ও দানশীলতা দেখে তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ নিজেদের উপর কাবু হারিয়ে ফেলতো।

৬. তিনি বিভিন্ন প্রকারের দান-খায়রাত করতেন, কখনো উপহারের মাধ্যমে, আবার কখনো সদকার মাধ্যমে, আবার কখনো উপঢৌকনের মাধ্যমে, আবার কখনো কোনো বস্তু ক্রয় করে বিক্রেতাকে ব্যবসা-পণ্য ও মূল্য উভয়টি দান করে, কখনো তিনি কোনো বস্তু ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে তার চেয়ে অধিক পরিশোধ করতেন, আবার কখনো তিনি উপহার গ্রহণ করে তার চেয়ে অধিক প্রতিদান দিতেন।”

(১০) সিয়াম বা রোযা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালার বিবরণ

(ক) রমযানের রোযা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:[64]

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখে চাঁদ দেখা কিংবা কোনো সাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্যবাণী ছাড়া মাহে রমযানের রোযা শুরু করতেন না, নচেৎ শা'বান মাসের গণনায় ত্রিশ দিন পূর্ণ করতেন।

২. ৩০শে শা'বানের রাত মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে, তিনি মাহে শা'বানকে ৩০ দিন পূর্ণ করতেন এবং সন্দেহের দিন তথা মেঘাচ্ছন্ন শা'বানের ৩০ তারিখ মাহে রমাযানের প্রথম দিন হওয়ার সন্দেহে সেই দিন রোযা রাখতেন না, আর না তার নির্দেশ দেন।

৩. তাঁর আদর্শ ছিল মাহে রমযানের ২৯ তারিখে রোযা শেষ করা দু'জন লোকের শাওয়ালের চাঁদ দেখার সাক্ষ্যবাণীর মাধ্যমে।

৪. ঈদের সালাতের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দু'জন ব্যক্তি চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করলে তিনি রোযা ছেড়ে দেন এবং সাহাবীদেরকে রোযা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন, অতঃপর দ্বিতীয় দিন সকালে ঈদের সালাত আদায় করেন।

---

[64] যাদুল মা'আদ : ২/৩০।

৫. তিনি সূর্যাস্তের সাথে সাথে অনতিবিলম্বে ইফতার করতেন এবং তজ্জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন আর সেহরী খেতেন এবং তজ্জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন এবং সেহরী শেষ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করে খেতেন এবং বিলম্ব করে সেহরী খাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন।

৬. তিনি সালাত আদায়ের পূর্বে ইফতার করতেন এবং তিনি তাজা-পাকা খেঁজুর দ্বারা ইফতার করতেন, তা না পেলে শুষ্ক খেঁজুর দ্বারা এবং তাও না পেলে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন।

৭. তিনি ইফতার শেষে বলতেন :

(ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)

'যাহাবায্ যামায়ু, ওয়াবতাল্লাতিল 'অরুক্ব, ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ্ ।"[65]

"পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনীগুলি সিক্ত হয়েছে এবং সাওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশা-আল্লাহ।"

৮. তাঁর আদর্শ ছিল মাহে রমাযানে বিভিন্ন প্রকারের ইবাদত অধিক পরিমাণে করা। মাহে রমযানে জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে পর্যায়ক্রমে কুরআন পাঠ দান করতেন।

---

[65] আবু দাউদ।

৯. তাঁর আদর্শ ছিল মাহে রমযানে অধিক পরিমানে সদকা-খায়রাত, তিলাওয়াতে কুরআন ও যিকর এবং ই'তেকাফ করা।

১০. তিনি রমযানে কতিপয় ইবাদত বিশেষভাবে করতেন যা তিনি অন্য কোনো মাসে করতেন না, তিনি কখনো সাওমে বেসাল অর্থাৎ বিরতিহীন রোযা রাখতেন, কিন্তু সাহাবীদেরকে তা থেকে বারণ করেন, তবে তাদেরকে সেহরী খাওয়ার সময় পর্যন্ত বিরতিহীন রোযা রাখার অনুমতি দেন।"

(খ) রোযা অবস্থায় জায়েয-নাজায়েয বিষয়াদি প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[66]:

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম পালনকারীকে অশ্লীল কথাবার্তা, গালি-গালাজ ও তার প্রত্যোত্তর এবং ঝগড়া বিবাদ করা হতে বারণ করেন, বরং যদি কেউ তাকে গালি দেয়, তবে সে উত্তরে 'আমি সিয়াম পালনকারী' বলার নির্দেশ দিতেন।"[67]

২. তিনি মাহে রমযানে সফরকালে কখনো রোযা রাখেন আবার কখনো রোযা ছেড়ে দেন, অনুরূপ সাহাবীদেরকে সফরে রোযা রাখা, না রাখা উভয়ের অনুমতি দেন।

---

[66] যাদুল-মা'আদ।

[67] বুখারী ও মুসলিম।

৩. তিনি সাহাবীদেরকে রোযা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিতেন যখন তারা রণাঙ্গনে শত্রুসেনার নিকটবর্তী হতো।

৪. তাঁর আদর্শ ছিল না দূরত্ব বা সীমা নির্ধারণ করা যা অতিক্রম করার পর রোযাদার রোযা ছাড়বে।

৫. বরং সাহাবীগণ সফর শুরু করলেই রোযা ছেড়ে দিতেন এলাকার ঘর-বাড়ী অতিক্রম করার চিন্তা-ভাবনা ছাড়া এবং তাঁরা বলেন: এটা তাঁর আদর্শমালা ও সুন্নাতের অন্তর্গত।

৬. কখনো স্ত্রী সহবাসজনিত অপবিত্র অবস্থায় তাঁর ফযর হয়ে যেতো, তখন তিনি ফজরের পর গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন।

৭. তিনি মাহে রমযানে রোযা অবস্থায় কখনো তাঁর কোনো স্ত্রীকে চুমু দিতেন।

৮. তিনি রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করতেন এবং রোযা অবস্থায় মাযমাযা বা কুলি ও ইস্তিনশাক্ব বা নাকে পানি গ্রহণ করতেন এবং রোযা অবস্থায় প্রচণ্ড গ্রীষ্মজনিত তাপ হ্রাস করার লক্ষ্যে স্বীয় মাথার উপর পানি ঢালতেন।

৯. তাঁর আদর্শ ছিল রোযাদার ভুলবশত পানাহার করলে তার থেকে কাযার হুকুম প্রত্যাহার করে রোযা পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া।

১০. তিনি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ও মুসাফিরের জন্য রোযা না রেখে পরে কাযা করার অনুমতি দেন, অনুরূপ বিধান গর্ভবর্তী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলাদের জন্য যদি তারা রোযা রাখার দরুন নিজেদের অথবা তাদের শিশুদের ক্ষতির আশংকা রোধ করে থাকে।”

(গ) নফল রোযা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[68]:

১. এ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ছিল পূর্ণাঙ্গ ও উদ্দেশ্য হাসিলে শ্রেষ্ঠতম এবং আত্মার উপর সহজতর। তিনি কখনো এতো অধিক রোযা রাখতেন যে, বলা হতো: হয়তো তিনি রোযা আর ছাড়বেন না, আবার তিনি রোযা ছেড়ে দিতেন এমনভাবে যে, বলা হতো: হয়তো তিনি সহসা আর রোযা রাখবেন না, তিনি মাহে রমযান ব্যতীত অন্য কোনো মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখেননি এবং শা’বান মাস ছাড়া আর কোনো মাসে এত অধিক নফল রোযা রাখেননি, আর এমন কোনো মাস অতিবাহিত হতো না যে মাসে তিনি অবশ্যই কয়েক দিন রোযা না রাখতেন।

২. তাঁর আদর্শ ছিল শুধু জুমআর দিনে রোযা রাখা অপছন্দ করা এবং তিনি প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখার জন্য খুবই সচেষ্ট থাকতেন।

---

[68] যাদুল মা‘আদ।

৩. তিনি আইয়্যামে বীদ্ব তথা প্রতি মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখা ছাড়তেন না, না সফরে না গৃহে অবস্থানকালে এবং তিনি আইয়ামে বীদ্বে রোযা রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন।

৪. তিনি প্রত্যেক মাসের শুরুতে তিন দিন রোযা রাখতেন।

৫. তিনি শাওয়ালের ছয় রোযা প্রসঙ্গে বলেন: রমযানের সাথে শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য।”[69]

আর তিনি রমযানের পর আশুরার (১০ই মুহাররামের) দিনের রোযাকে অন্য যে কোনো দিনের রোযা অপেক্ষা মাহাত্ম্যপূর্ণ মনে করতেন।

৬. তিনি আরাফার (৯ই যুলহাজ্জের) দিনের রোযা প্রসঙ্গে বলেন: উক্ত রোযা বিগত এক বছরের এবং আগামী এক বছরের পাপরাশিকে মোচন করে দেয়।”[70] তবে তাঁর আদর্শ ছিল আরাফার দিন ময়দানে আরফায় অবস্থানকালে রোযা না রাখা।

---

[69] মুসলিম।

[70] মুসলিম।

৭. তাঁর আদর্শ ছিল না সারা বছর রোযা রাখা, বরং এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: যে কেউ সারা বছর রোযা রাখলো, প্রকৃতপক্ষে সে না রোযা রাখলো, আর না সে রোযা ছাড়লো।"[71]

৮. তিনি কখনো নফল রোযার নিয়্যাত করতেন, অতঃপর রোযা ছেড়ে দিতেন, আবার কখনো স্বীয় পরিবারের নিকট এসে জিজ্ঞেস করতেন: তোমাদের নিকট কি খাবারের কিছু আছে? যদি তারা উত্তরে বলতো: না, তখন তিনি বলতেন: তাহলে আমি সিয়াম পালন করলাম।"[72]

৯. তিনি বলেছেন : যদি তোমাদের কাউকে খাবারের প্রতি আহ্বান করা হয় অথচ সে রোযাদার, তখন সে উত্তরে বলবে : 'আমি সিয়াম পালন করছি।"

(ঘ) ই'তেকাফ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:[73]

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে এ'তেকাফ করতেন, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আয্যা-ওয়াজাল্লা তাঁকে উঠিয়ে নেন। তবে তিনি একবার ই'তেকাফে ছিলেন না, অতঃপর তা শাওয়ালে কাযা করেন।

---

[71] নাসাঈ।

[72] মুসলিম।

[73] যাদুল মা'আদ : ২/৮২।

২. তিনি ‘লাইলাতুল ক্বদর’ তালাশ করার লক্ষ্যে একবার প্রথম দশ দিনে ই‘তেকাফ করেন, তারপর মধ্যম দশ দিনে, তারপর শেষ দশ দিনে, অতঃপর যখন তিনি জেনে নিলেন যে, ‘লাইলাতুল ক্বদর’ শেষ দশ দিনে বিদ্যমান, তখন থেকে তিনি সর্বদা শেষ দশ দিনে ই'তেকাফ করতেন, যতক্ষণ না তিনি আল্লাহর নিকট প্রত্যাগমণ করেন।

৩. তিনি কখনই রোযা ছাড়া ই‘তেকাফ করেননি।

৪. তাঁর নির্দেশে মসজিদে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির তাঁবু স্থাপন করা হতো, আর তিনি তাতে নির্জনতা অবলম্বন করতেন।

৫. তিনি ই‘তেকাফের ইচ্ছা করলে ফজরের সালাতের পরেই প্রবেশ করতেন।

৬. তিনি ই‘তেকাফ করলে তাঁর বিছনা-পত্র ই‘তেকাফস্থলে রাখা হতো এবং তাতে তিনি একলা নির্জনে প্রবেশ করতেন।

৭. তিনি মানবিক প্রয়োজন ছাড়া ঘরে যেতেন না।

৮. তিনি স্বীয় মাথা উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা এর ঘরের দিকে বের করে দিতেন, তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতেন যখন তিনি হায়েয অবস্থায় থাকতেন।

৯. তিনি ই‘তেকাফে থাকা অবস্থায় তাঁর কোনো কোনো স্ত্রী সাক্ষাত করতে যেতেন, সাক্ষাৎ শেষে প্রত্যাবর্তন কালে তিনি তাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে বের হন, তখন রাত্রিবেলা ছিল।

১০. তিনি ই‘তেকাফ থাকা অবস্থায় তাঁর কোনো স্ত্রীর সাথে সহবাস করতেন না, আর না কোনো স্ত্রীকে চুমু দিতেন।

১১. তিনি প্রত্যেক বছর দশ দিন করে ই‘তেকাফ করতেন, কিন্তু যেই বছর তিনি মারা যান, সেই বছর বিশ দিন ই‘তেকাফ করেন।”

(১১) হজ্জ-ওমরাহ্ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালার বিবরণ[74]

(ক) ওমরাহ্ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার ওমরাহ্ পালন করেন, (এক) হুদায়বিয়ার ওমরাহ, যখন মুশরিকরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল, তখন তিনি হুদায়বিয়া নামক স্থানে হাদী যবেহ করেন এবং মাথা মুণ্ডন করে হালাল হয়ে যান। (দুই) ওমরাতুল কাযা, যা তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধি মোতাবেক পরবর্তী বৎসর আদায় করেছিলেন। (তিন) যেই ওমরাহ্ তিনি হজ্জের সাথে আদায় করেছিলেন। (চার) তিনি জিয়িররানা থেকে একটি ওমরাহ্ আদায় করেছিলেন।[75]

২. তাঁর জীবনে কোনো ওমরাহ্ মক্কা হতে বর্হিগমনকালে ছিল না, বরং সবকয়টি ওমরাহ্ ছিল মক্কায় প্রবেশকালে।

৩. বৎসরে একাধিক ওমরাহ্ করা তাঁর থেকে প্রমাণিত নেই, তিনি কখনই এক বৎসরে দু'ইবার ওমরাহ্ করেন নি।

৪. তাঁর সকল ওমরাহ্ আদায় হজ্জের মাসসমূহে ছিল।

---

[74] যাদুল মা'আদ : ২/৮৬।

[75] যা হোনাঈন যুদ্ধের সময় হয়েছিল।

৫. তিনি বলেন, মাহে রমযানে ওমরাহ্ আদায় হজ্জের সমতুল্য।"[76]

(খ) হজ্জ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা [77]:

১. হজ্জ ফরয হওয়ার পর অনতি বিলম্বে তিনি হজ্জ আদায় করেন এবং তিনি জীবনে একবার মাত্র হজ্জ করেন এবং তা ছিল হজ্জে ক্বেরান।

২. তিনি যোহরের সালাতের পর হজ্জের ইহরাম বাঁধেন, অতঃপর তালবিয়া পাঠ করে বলেন:

«لبيك اللّٰهُمَّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك».

'লাব্বাইকা-আল্লাহুম্মা-লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নে'অমাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাক।"[78]

"আমি উপস্থিত হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত তোমার কোনো শরীক নেই আমি উপস্থিত, নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা এবং

---

[76] বুখারী ও মুসলিম।

[77] যাদুল মা'আদ: ২/৯৬।

[78] মুসলিম।

নে‘আমতসমূহ তোমার, আর সমুদয় রাজত্ব তোমার, তোমার কোনো শরীক নেই।”

আর তিনি এই তালবিয়া উচ্চস্বরে পাঠ করেন, যাতে তাঁর সাহাবীগণ শুনতে পান। তিনি তাদেরকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করার নির্দেশ দেন এবং তিনি লাগাতার তালবিয়া পড়তে থাকেন। লোকেরা তাতে কম-বেশী করছিল কিন্তু তিনি তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন নি।

৩. তিনি ইহরাম বাঁধার সময় সাহাবীদেরকে হজ্জের তিন প্রকারের যে কোনো একটি মনোনীত করার অনুমতি দেন, অতঃপর তিনি মক্কার নিকটবর্তী হলে হজ্জে ইফরাদ ও হজ্জে ক্বেরানকরীদের মাঝে যাদের সাথে হাদী তথা হজ্জের কুরবানীর পশু ছিল না তাদেরকে হজ্জের ইহরামের বদলে ওমরার নিয়্যাত করার উৎসাহ প্রদান করেন।

৪. তিনি উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার হয়ে হজ্জ আদায় করেন, পাল্কি কিংবা হাওদা-ডুলির মধ্যে নয় এবং খাদ্যদ্রব্য ও সফরের সামান তাঁর সাথেই ছিল।

৫. তিনি মক্কায় উপনীত হয়ে এ মর্মে নির্দেশ জারী করেন যে, যাদের সাথে হাদীর পশু নেই তারা যেন হজ্জের ইহরাম ভঙ্গ করে ওমরার নিয়্যাত করে এবং ওমরাহ্ আদায়ের পর ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যায়। আর যাদের সাথে হাদী রয়েছে তারা যেন ওমরাহ্ আদায়ের পর ইহরাম অবস্থায় থাকে। অতঃপর তিনি সওয়ারীতে আরোহন

করে ‘যী-তুয়া’ নামক উপত্যকায় অবতরণ করেন এবং সেখানে মাহে যিল-হজ্জের চতুর্থ তারিখে রবিবারের রাত কাটান এবং সেখানে ফজরের সালাত আদায় করেন। অতঃপর গোসল করে দিনের বেলায় মক্কার হুজুনের দিকে অবস্থিত ‘সানিয়াতুল ‘উলইয়া’-নামক এলাকা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করেই বায়তুল্লাহর অভিমুখে রাওয়ানা হন, তখন তিনি তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়েননি এবং হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে তাকে স্পর্শ করেন এবং তার উপর ভীড় করেন নি। অতঃপর বায়তুল্লাহকে বামে রেখে ডান পার্শ্ব দিয়ে তাওয়াফ শুরু করেন এবং কা‘বার দরজায় কিংবা মীযাবের নিচে অথবা কা‘বা ঘরের পিছনে কিংবা চারকোণে কোনো নির্দিষ্ট দু‘আ পাঠ করেন নি। তবে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে এই আয়াতটি পাঠ করা তাঁর থেকে প্রমাণিত রয়েছে :

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١]

‘রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাহ্, ওয়াফিল আ-খিরাতে হাসানাহ্, ওয়াক্বিনা ‘আযা-বান্নার।’

“হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে জাহান্নামের আগুনের আযাব হতে রক্ষা কর।” এটা ছাড়া তাওয়াফের জন্য আর কোনো নির্দিষ্ট দু‘আ নির্ধারণ করেন নি। আর তিনি এর তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করেন- অর্থাৎ ছোট ছোট কদমে বা পদক্ষেপে দ্রুত চলেন এবং এই

তাওয়াফে ‘ইদতিবা’ করেন- অর্থাৎ পরিহিত চাদরের মধ্যভাগকে ডান কাঁধের নীচ দিয়ে চাদরের উভয় কোণ বাম কাঁধের উপর ধারণ করেন এবং ডান বাহু ও ডান কাঁধ খোলা রাখেন। যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকটবর্তী হতেন তখন ‘আল্লাহু আকবার’ বলে তার প্রতি ইশারা করতেন কিংবা হাতের ছড়ি দিয়ে স্পর্শ করতেন এবং ছড়িকে চুমু দিতেন। (আরবী শব্দ ‘মেহজন’ মানে মাথা বাঁকা হাতের ছড়ি), আর রুকনে ইয়ামানীর নিকট পৌঁছে সেটাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করেন কিন্তু তাকে চুমু দেন নি, আর স্পর্শ করার পর হাতেও চুমু দেননি, অতঃপর তাওয়াফ শেষে মাক্কামে ইবরাহীমের পিছনে এসে এ আয়াতটি পাঠ করেন:

﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗىۖ﴾ [البقرة: ١٢٥]

“তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।”[79]

এবং সেখানে দু’রাকাত সালাত আদায় করেন তখন মাক্কামে ইবরাহিমী তাঁর ও বায়তুল্লাহর মধ্যস্থলে ছিল, উক্ত দু’রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ইখলাসের সুরাদ্বয় তথা ‘কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এবং কুল হুয়াল্লাহ আহাদ’ পাঠ করেন, সালাত শেষে হাজরে আসওয়াদের নিকটবর্তী হয়ে তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করেন, অতঃপর সাফা পাহাড়ের অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সাফার নিকটবর্তী হলে এই আয়াতটি পাঠ করেন:

---

[79] সূরা বাক্কারাহ্, আয়াত ১২৫।

﴿ ۞إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝١٥٨ ﴾ [البقرة: ١٥٨]

"নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত, সুতরাং যে ব্যক্তি কা'বা ঘরের 'হজ্জ' অথবা উমরাহ্ পালন করে, তার জন্যে এতদুভয়ের মাঝে 'সাঈ' করা দোষণীয় নয়, বরং কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমলের সঠিক মূল্যায়নকারী, মহাজ্ঞানী।"[80]

তিনি বলেন: আমি সেখান থেকেই (অর্থাৎ সাফা থেকেই) আরম্ভ করবো যেখান থেকে আল্লাহ আরম্ভ করেছেন, (অর্থাৎ আল্লাহ যার কথা কুরআনে আগে বলেছেন) অতঃপর সাফা পাহাড়ে আরোহণ করেন যেখান থেকে তিনি বায়তুল্লাহ্ দেখতে পান, তখন তিনি ক্বেবলামুখি হয়ে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেন এবং তাকবীর বলে এ দু'আ পাঠ করেন:

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده».

"লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাবহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন-ক্বাদীর, লা-ইলা-হা

---

[80] সূরা বাক্বারাহ্ আ: ১৫৮।

ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু আনজাযা ওয়া‘দাহ্, ওয়া নাসারা আব্দাহ্, ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহ্দাহ।’[81]

“আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক ও একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, সমগ্র রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোনো মা‘বুদ নেই, তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই শত্রু সৈন্যদলকে পরাজিত করেছেন।”

অতঃপর তিনি দু‘আ করেন এবং তিনি অনুরূপ তিনবার করার পর মারওয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। অতঃপর দু’পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমভুমিতে পৌছে দৌড়ে দ্রুত গতিতে উপত্যকা অতিক্রম করেন, আর তা হলো দুই সবুজ বাতির মধ্যবর্তী স্থান, তিনি পায়ে হেটে সা‘য়ী শুরু করেন, কিন্তু তাঁর উপর লোকদের অধিক ভীড় হলে তিনি সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে সা‘য়ী পূর্ণ করেন। আর তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে তার উপরাংশে আরোহণ করেন, তখন তিনি ক্বেবলামুখি হয়ে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেন এবং তাকবীর বলেন এবং অনুরূপ করেন যেরূপ তিনি করেছিলেন সাফা পাহাড়ের সাফা পাহাড়ের উপর, তারপর যখন সপ্তম চক্করে মারওয়ার নিকটে সায়ী সমাপ্ত করেন, তখন তিনি জরুরীভিত্তিতে নির্দেশ জারী করেন যে, যাদের সাথে হাদী-কুরবানীর পশু নেই তারা যেন ইহরাম থেকে

---

[81] আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্।

পূর্ণরূপে হালাল হয়ে যায়, যদিও সে হজ্জে কিরান কিংবা ইফরাদের নিয়্যাত করে থাকে। আর যেহেতু তাঁর সঙ্গে হাদী ছিল, তাই তিনি ইহরাম থেকে হালাল হননি এবং বলেন : যদি আমি আগে জানতাম যা পরে জেনেছি, তবে আমি হাদীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসতাম না, বরং হজ্জের ইহরামকে ওমরার দ্বারা পরিবর্তন করে দিতাম।”[82] আর তিনি মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্যে তিনবার দু‘আ করেন এবং চুল খাটোকারীদের জন্যে একবার। তিনি মক্কায় অবস্থানকালে জিল-হাজ্জ মাসের ৮ তারিখ পর্যন্ত তাঁর বাসস্থানে সালাতসমূহ জামা‘আতের সাথে কসর করে আদায় করেন, তারপর তিনি ৮ তারিখের সকালে সাথীদেরকে নিয়ে মিনায় পৌঁছে যোহর ও আসরের সালাত নির্দিষ্ট ওয়াক্তে আদায় করেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করেন। ৯ তারিখের সূর্যোদয়ের পর আরাফা অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন সাহাবীদের কেউ তালবিয়াহ্ পাঠ করছিল, আবার কেউ তাকবীর বলছিল, তিনি তা শুনছিলেন কিন্তু কারো উপর অসম্মতি প্রকাশ করেন নি। অতঃপর নামিরায় পৌঁছে তিনি একটি গোলাকৃতির তাঁবুতে প্রবেশ করেন- যা তাঁর নির্দেশে তাঁর জন্যে স্থাপন করা হয়েছিল, মূলত: নামিরাহ্ নামক স্থান আরাফার অন্তর্গত নয়, বরং সেটি আরাফার পশ্চিমপ্রান্তে একটি এলাকার নাম। সূর্য ঢলা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন, তারপর স্বীয় ‘ক্বাসওয়া’ নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে ‘ওরানাহ্ উপত্যকায় গমন করেন এবং স্বীয় উষ্ট্রীর উপর বসে একটি মাহাত্ম্যাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন; যাতে

---

[82] বুখারী ও মুসলিম।

ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং শির্ক ও জাহিলিয়্যাতের ভিত্তিসমূহ ধ্বসিয়ে দেন এবং যেসব বিষয়াবলী সকল ধর্ম ও মিল্লাতে হারাম সেগুলোর নিষিদ্ধতার উপর তাকীদ প্রদান করেন এবং জাহিলী যুগের কুসংস্কার ও সুদকে নিজের পায়ের নিচে রাখেন, সেই খুৎবায় জনগণকে মহিলাদের প্রতি সদাচারণের নির্দেশ দেন। কুরআন-সুন্নাহকে দৃঢ়তার সাথে অবলম্বন করে চলার অসিয়াত করেন, তারপর তিনি সাহাবীদের থেকে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন যে, তিনি আল্লাহর পয়গাম তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দিয়েছেন এবং আমানত সম্পূর্ণরূপে আদায় করেছেন এবং উম্মতকে নসীহত করেছেন, অতঃপর উক্ত স্বীকারোক্তির উপর আল্লাহকে সাক্ষী রাখেন। তারপর খোৎবা শেষে বেলাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে আযানের নির্দেশ দিলে তিনি আযান ও ইকামত দেন। তখন তিনি যোহরের সালাত কসর করে দু'রাকাত আদায় করেন এবং তাতে নিম্নস্বরে কেরাত পড়েন অথচ সেই দিন শুক্রবার ছিল। তারপর ইকামত দিয়ে আসরের সালাত দু'রাকাত আদায় করেন। অথচ তখন তাঁর সঙ্গে মক্কার অধিবাসীগণও ছিল, কিন্তু তিনি তাদেরকে যোহর-আসরের সালাত চার রাকাত পূর্ণ করার নির্দেশ দেন নি, আর না তাদেরকে 'জম'য়ে-তাকদীম' না করার হুকুম দেন। অতঃপর সালাত শেষে তিনি সাওয়ারীতে আরোহণ করে আরাফাতের সীমার মধ্যে অবস্থান করার উদ্দেশ্য গমণ করেন। আরাফার দিন তাঁর রোযা রাখার ব্যাপারে লোকদের মাঝে সন্দেহ দেখা দিলে উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা তাঁর নিকট একটি পাত্রে সদ্য দোহন

করা দুধ পাঠিয়ে দেন, তখন তিনি আরাফায় অবস্থানরত ছিলেন, তিনি তা পান করেন এবং লোকগণ তা দেখছিল। তিনি 'জাবালে রহমত' নামক পাহাড়ের নিচে পাথরসমূহের নিকট 'জাবালে মুশাত'-কে সম্মুখে রেখে ক্বিবলামুখী হয়ে অবস্থান করেন। তিনি স্বীয় উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার ছিলেন এবং তিনি সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দু'আ-প্রার্থনা করতে থাকেন, তিনি লোকদেরকে 'ওরানাহ্' নামক উপত্যকায় অবস্থান না করার নির্দেশ দেন এবং বলেন: "আমি এখানে অবস্থান করছি, তবে 'আরাফার প্রান্তর সবই অবস্থানস্থাল।"[83] তখন তিনি দু'আ করার সময় ভিখারীর ন্যায় সীনা মুবারক পর্যন্ত হাত উত্তোলন করেন এবং বলেন, শ্রেষ্টতম দু'আ হলো আরাফার দিনের দু'আ, আর আমি এবং আমার পুর্ববর্তী নবীগণ কর্তৃক উচ্চারিত শ্রেষ্ঠতম বাণী হলো:

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।"[84]

আর যখন আরাফার দিনে সূর্যাস্ত হয়ে যায় এবং সূর্যাস্তের ব্যাপারটি নিশ্চিত হয় এভাবে যে, সূর্যের সোনালী রং শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি ওসামা ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে সাওয়ারির পিছনে

---

[83] মুসলিম।

[84] তিরমিযী।

আরোহণ করিয়ে ধীরস্থিরতার সাথে মুযাদালিফার দিকে যাত্রা করেন এবং তিনি উষ্ট্রীর লাগাম নিজের দিকে টেনে রাখেন এমনভাবে যে, তার মাথা সওয়ারীর কিনারায় যেন যোগ করছিলেন এবং তিনি বলছিলেন: "হে লোক সকল! তোমরা প্রশান্তি ও ধীরস্থিরতার সাথে চলো, কেননা সৎকর্ম তাড়াহুড়া করার মধ্যে নয়।"[85] আর তিনি 'আল-মা'যেমাইন' নামক রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তিনি 'দ্বব্ব' নামক রাস্তা দিয়েই আরাফায় প্রবেশ করেছিলেন, আর প্রত্যাবর্তন কালে তাঁর চলার গতি ছিল মধ্যম, কিন্তু যখন কোনো বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কিংবা ফাঁকা পথে উপনীত হতেন, তখন দ্রুত গতিতে চলতেন এবং তিনি পথ অতিক্রম কালে লাগাতার তালবিয়া পাঠ করছিলেন। তিনি পথিমধ্যে অবতরণ করে পেশাব করেন, তারপর হাল্কা অযু করে পথ চলেন এবং মাগরিবের সালাত পড়েননি যতক্ষণ না তিনি মুযদালিফায় পৌঁছেন। অতঃপর মুযদালিফায় পৌঁছে সালাতের জন্য অযু করেন এবং বিলাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে আযান ও ইকামতের নির্দেশ দেন। অতঃপর উষ্ট্রীর পিঠ থেকে মাল-সামান রাখার এবং উটের পাল বাঁধার পূর্বেই মাগরিবের সালাত তিন রাকাত আদায় করেন, অতঃপর লোকসকল নিজ নিজ জায়গায় নিজেদের উট বসিয়ে দিলে আযান ছাড়া শুধু ইকামত দিয়েই 'এশার সালাত কসর করে আদায় করেন এবং মাগরিব ও 'এশার মাঝে তিনি আর কোনো সালাত পড়েননি। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন ফজর পর্যন্ত এবং সেই রাত জাগ্রত থাকেননি, তবে অর্ধরাত্রি যাপন

---

[85] বুখারী।

করার পর পরিবারের দুর্বল লোকদেরকে মিনার দিকে যাত্রা করার অনুমতি প্রদান করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন তারা যেন জমরাতে কংকর নিক্ষেপ না করে যতক্ষণ না সূর্য উদিত হয়। অতঃপর ফজরের সময় হলে আযান ও ইকামত দিয়ে প্রথম ওয়াক্তেই ফজরের সালাত আদায় করেন। তারপর সাওয়ারীতে আরোহণ করে মাশ'আরে হারামের নিকট গমন করেন এবং লোকদের লক্ষ্য করে বলেন: "পুরো মুযদালিফাই অবস্থানস্থল।"[86] তখন তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে অধিক হারে আল্লাহর যিকির, তাকবীর, তাহলীল, দু'আ-প্রার্থনা করতে থাকেন যে পর্যন্ত না প্রভাতের আলো অনেকটা ফর্সা হয়ে উঠে। অতঃপর সূর্যোদয়ের আগেই ফাদল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-কে সাওয়ারীর পিছনে বসিয়ে মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে যাত্রা করেন।

পথিমধ্যে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে নির্দেশ দেন যে, যেন তিনি জামরাতে নিক্ষেপ করার জন্য সাতটি কংকর বেছে নেন। অতঃপর তিনি সেগুলোকে তাঁর হাতে রেখে তাতে ফুৎকার করতে করতে বলেন: "তোমরা জামরাতে অনুরূপ ছোট ছোট কংকর নিক্ষেপ করো এবং ধর্মে অতিরঞ্জন করা হতে সতর্ক থেকো।"[87] আর তিনি 'মুহাস্‌সার' নামক উপত্যকায় পৌঁছলে দ্রুত গতিতে তা অতিক্রম করেন। আর তিনি মধ্যম পথ দিয়ে চলেন যেটি সোজা

---

[86] মুসলিম।

[87] নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্‌।

জামরাতুল কোবরায় নিয়ে যায়। তিনি কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়াহ্ পাঠ করছিলেন। তিনি সূর্যোদয়ের পর উষ্ট্রীর উপর সওয়ার অবস্থায় উপত্যকার নিচ থেকে জামরাতুল 'আকাবা বা বড় জামরাতে পর পর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। তখন তিনি কা'বা শরীফকে বাম দিকে এবং মিনাকে ডান দিকে রাখেন এবং প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু-আকবার'-তাকবীর বলেন। অতঃপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করে একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ্য ভাষণ প্রদান করেন, যাতে কুরবানীর দিনের ফযীলত এবং মক্কার মান-মর্যাদা সম্পর্কে লোকদের অবহিত করেন এবং শাসকবর্গের যারা কুরআন-সুন্নাহ্ দ্বারা নেতৃত্ব দেয় তাদের কথা শোনা ও মান্য করার নির্দেশ দেন। তাদেরকে হজ্জের বিধি-বিধান শিক্ষা দেন, তারপর মিনায় পশু যবেহ করার স্থানে গমন করে নিজ হতে ৬৩ টি মোটা-তাজা উট কুরবানী করেন, উট যবেহ করার সময় সেগুলি দাঁড়ানো এবং বাম-পা বাঁধা অবস্থায় ছিল, অতঃপর এক শত উটের অবশিষ্টগুলিকে যবেহ্ করার জন্য 'আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে নির্দেশ দেন। কুরবানীর পশুর গোশ্ত অভাবগ্রস্ত -দরিদ্র লোকদের মাঝে বন্টন করে দিতে বলেন। কিন্ত কসাইকে তার মজদুরী হিসেবে কুরবানীর গোশ্ত দিতে নিষেধ করেন। তিনি তাদের আরও জানান যে, পুরো মিনাই যবাই-নাহর করার স্থল এবং মক্কার গিরিপথসমূহ রাস্তাও যবাই-নাহর করার স্থল।

অতঃপর কুরবানীর পশু যবেহ্ করা শেষে নাপিতকে ডেকে পাঠান, নাপিত প্রথমে তাঁর মাথার ডান অর্ধাংশ মুণ্ডন করলে তিনি তা আবু

তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে প্রদান করেন, অতঃপর বাম অর্ধাংশ মুণ্ডন করলে তিনি চুলগুলো আবু ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে দিয়ে বলেন: “এগুলি জনগণের মাঝে বন্টন করে দাও।”[88] তিনি মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্যে তিনবার দু‘আ করেন এবং চুল খাটোকারীদের জন্যে একবার। আর উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তাঁকে খুশবু মাখিয়ে দেন। অতঃপর যোহরের আগে সাওয়ারীতে আরোহণ করে মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাওয়াফে ইফাদাহ্ বা ফরয তাওয়াফ আদায় করেন। সেদিন অন্য কোনো তাওয়াফ করেননি এবং তাওয়াফের সথে সা‘য়ীও করেননি[89], তিনি ফরয তাওয়াফ কিংবা বিদায় তাওয়াফে ‘রমল’ করেননি, বরং শুধুমাত্র তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফে ‘রমল’ করেন।

অতঃপর তাওয়াফ শেষে যমযমের নিকট আসেন তখন লোকেরা পানি পান করছিল, লোকেরা তাঁকে পানির পাত্র উঠিয়ে দিলে তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় যমযমের পানি পান করেন। অতঃপর মিনায় ফিরে আসেন এবং মিনাতেই রাত্রি যাপন করেন। সেদিন যোহরের সালাত কোথায় আদায় করেন, এ মর্মে মতানৈক্য রয়েছে, ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর বর্ণনায় তিনি সেদিন যোহরের সালাত

---

[88] বুখারী ও মুসলিম।

[89] কেননা ক্বারেন হাজীর জন্য তাওয়াফে ওমরাহ ও তাওয়াফে ইফাযাহ্ এবং একটি সায়ী যথেষ্ট, আর বিদায়ী তাওয়াফ তো ঋতুবর্তী মহিলা ছাড়া বহিরাগত সকল হাজীদের উপরই ওয়াজিব।’’-অনুবাদক

মিনাতে পড়েন, আর জাবের ও উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: তিনি সেদিন যোহরের সালাত মক্কাতেই পড়েন।

অতঃপর ১১ তারিখের সকালে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার অপেক্ষা করেন, অতঃপর সূর্য ঢলার পর তিনি তাবু থেকে জামারাত অভিমুখে পায়ে হেঁটে যাত্রা যাত্রা করেন এবং সেদিন সাওয়ারিতে আরোহণ করেন নি, সেথায় পৌঁছে প্রথমে মসজিদে খাইফের সন্নিকটে অবস্থিত প্রথম জামরাতে কংকর মারা শুরু করেন এবং তাতে একের পর এক সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং প্রত্যেক কংকরের সাথে ‘‘আল্লাহু আকবার’’-তাকবীর বলেন।

তারপর জামরাহ থেকে কিছুটা অগ্রসর হয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত উত্তোলন করে সূরা বাক্বারার সমপরিমাণ দীর্ঘক্ষণ দু‘আ-প্রার্থনা করেন।

তারপর মধ্যম জমরায় পৌছে সেখানেও প্রথমবারের ন্যায় কংকর নিক্ষেপ করেন, তারপর কিছুটা সম্মুখে উপত্যকার দিকে সরে গিয়ে জামরাকে ডান দিকে রেখে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে প্রায় প্রথমবারের ন্যায় দীর্ঘক্ষণ দু‘আ-প্রার্থনা করেন। তারপর তৃতীয় জমরাতুল আক্বাবার প্রতি অগ্রসর হন এবং সেখানে পৌছে বাম দিকে উপত্যকা সংলগ্ন স্থানে গমন করেন এবং জামরাকে সামনে রেখে এবং কাবা শরীফকে বাম দিকে এবং মিনাকে ডান দিকে রেখে অনুরূপ সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন।

আর কংকর নিক্ষেপ সম্পন্ন করে ফিরে আসেন এবং সেথায় দাঁড়াননি।

অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো যে, তিনি যোহরের সালাতের পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর ফিরে এসে সালাত আদায় করেন। তবে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে হাজীদের পানি সরবরাহ করার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে মিনার দিনগুলোতে মক্কায় রাত কাটানোর অনুমতি দেন। তিনি তাড়াতাড়ি করে ১২ তারিখে মিনা ত্যাগ করেন নি, বরং বিলম্ব করে ‘আইয়্যামে তাশরীক্বের তিন দিনই জামরাহ্গুলোতে কংকর নিক্ষেপ করেন। অতঃপর মুহাস্সাব নামক স্থানে এসে অবস্থান করেন। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার সালাত প্রত্যেকটিকে তার সময়মত আদায় করেন এবং অল্প কিছু সময় নিদ্রা যান। অতঃপর সাওয়ারীতে আরোহণ করে মক্কা পৌছে রাত সেহেরীর সময় বায়তুল্লাহর বিদায়ী তাওয়াফ করেন এবং এ তাওয়াফে ‘রমল’ করেননি, তখন উম্মুল মু’মিনীন সাফিয়্যাহ ঋতুবর্তী হয়ে পড়লে তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফের হুকুম শিথিল করেন, তাই তিনি বিদায় তাওয়াফ করেন নি।

সে রাতেই আয়েশাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার মনস্তুষ্টির জন্য তাঁর ভাই আব্দুর রহমানকে সাথে নিয়ে ‘তান‘ঈম’ থেকে ইহরাম বেঁধে একটি ওমরাহ্ আদায় করার ব্যবস্থা করে দেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ওরমাহ্ শেষে রাতে ফিরে এলে তিনি সাহাবীদেরকে সফরের নির্দেশ দেন, তখন সবাই মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন।”

(১২) হাদী, কুরবানী ও 'আকীকাহ্ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[90]

(ক) হাদী প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[91]:

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট ও ছাগলপাল হাদী হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ হতে হাদী হিসেবে গরু প্রেরণ করেন। তিনি হজ্জ ও ওমরার সময় এবং (হুদায়বিয়ার সন্ধি কালে) অবস্থান স্থলে হাদী যবেহ্ করেন।

২. তাঁর আদর্শ ছিল, হাদী হিসেবে প্রেরিত ছাগলপালের গলায় বেড়ি লাগানো, সেগুলোর গলায় ছুরির আঘাতে দাগ করা নয়। তিনি স্বীয় হাদী প্রেরণের পর (ইহরাম বাঁধার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত) কোনো হালাল বিষয়াদিকে নিজের উপর হারাম মনে করেন নি।

৩. তিনি হাদি হিসেবে উট প্রেরণ করলে সেগুলিকে 'তাক্লীদ'-গলায় বেড়ী লাগাতেন, বা 'এশআর' করতেন- অর্থাৎ উটের ডান কুজেঁ ছুরির আঘাতে সামান্য দাগ লাগাতেন।

৪. তিনি হাদী প্রেরণ করার সময় দূতকে বলে দিতেন যে, কোনো হাদী মৃত্যুমুখী হলে সেটি যবেহ্ করে দেবে, অতঃপর তার রক্তে স্বীয়

---

[90] যাদুল মা'আদ :২/২৮৫।

[91] মক্কার হারাম শরীফে হজ্জ-উমরা একই সফরে করার সুযোগ গ্রহণ করার কারণে শোকরিয়াস্বরূপ যে পশু যবেহ করতে হয় সে নির্দিষ্ট পশুকে হাদী বলা হয়।" অনুবাদক।

জুতা রঙ্গিন করে তার উপরিভাগে রেখে দেবে, সে নিজে কিংবা সাথীবর্গের কেউ সে পশুর গোশ্‌ত ভক্ষন করবে না, অতঃপর গোশ্‌ত অন্য লোকদের মাঝে বন্টন করে দেবে।

৫. তিনি হাদীতে সাহাবীদের অংশীদার করে দিতেন, উটে সাতভাগ এবং গরুতে সাত ভাগ।

৬. তিনি রাখালকে বিশেষ প্রয়োজনে অন্য সওয়ারী পাওয়া পর্যন্ত হাদীতে আরোহণ করার অনুমতি দেন।

৭. তাঁর আদর্শ ছিল: উটকে দাঁড়ানো ও বাম পা বাঁধানো অবস্থায় নহর করা, তিনি নহর করার সময় 'বিসমিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবর' বলতেন।

৮. তিনি নিজ হাতেই কুরবানীর পশু যবেহ্‌ করেন, আবার কখনো অন্যকে অবশিষ্টগুলো যবেহ্‌ করার দায়িত্ব প্রদান করেন।

৯. তিনি ছাগল-দুম্বা যবেহ্‌ করার সময় তাঁর এক পা দিয়ে ছাগল-দুম্বার পাঁজর দাবিয়ে রাখতেন, অতঃপর 'বিসমিল্লাহি-আল্লাহু আকবর' বলে যবেহ্‌ করতেন।

১০. তিনি উম্মতকে কুরবানী ও হাদীর গোশ্‌ত খাওয়া ও জমা রাখার অনুমতি দিয়েছেন।

১১. তিনি কখনো হাদীর গোশ্‌ত বন্টন করে দিতেন, আবার কখনো বলেন: যার ইচ্ছা কিছু অংশ রেখে দেবে।

১২. তাঁর আদর্শ ছিল ওমরার হাদী যবেহ্‌ করা মারওয়া পাহাড়ের নিকটে, আর হজ্জে কেরানের হাদী যবেহ্‌ করা মিনাতে।

১৩. তিনি কখনও ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পূর্বে স্বীয় হাদী নহর করেননি, বরং তিনি শুধুমাত্র সূর্যোদয়ের পর এবং জমরাতে কংকর নিক্ষেপের পরই হাদী নহর করেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে হাদী নহর করার অনুমতি কখনও তিনি দেননি।"

(খ) কুরবানী প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[92]:

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কুরবানী করা পরিত্যাগ করেননি এবং তিনি দু'টি দুম্বা দিয়ে কুরবানী করতেন এবং ঈদের সালাতের পর সেগুলো যবেহ্‌ করতেন। তিনি বলেন: "আইয়্যামে তাশরীক্ব তথা ১১, ১২, ১৩ তারিখও কুরবানীর পশু যবেহ করার দিবস।"[93]

২. তিনি আরো বলেন: যে কেউ ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করলো, তার কুরবানী বলতে কিছুই হলো না, বরং সেটা কেবল

---

[92] যাদুল মা'আদ : ২ /২৮৯।

[93] মুসনাদে আহমদ।

খাবার গোশ্‌ত হলো, যা সে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য আগাম ব্যবস্থা করলো।”[94]

৩. তিনি ছাগল-মেষ জাতীয় পশুর ছয় মাসের ছানা এবং পাঁচ বছর উত্তীর্ণ উট, আর দু’বছর উত্তীর্ণ গরু কুরবানী করার নির্দেশ দেন।

৪ তাঁর আদর্শ ছিল কুরবানীর জন্য সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত পশু বাচাই করা। তিনি কান-কাটা, শিং-ভাঙ্গা, এক চোখ-কানা, নেংড়া, পা ভাঙ্গা, ও অতি দুর্বল পশু দিয়ে কুরবানী করতে নিষেধ করেন এবং তিনি চোখ-কান ত্রুটিমুক্ত হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেন।

৫. তিনি আরো নির্দেশ দেন, যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে সে যেন যিল-হাজ্জ মাসের প্রথম দশক প্রবেশের পর নিজের নখ-চুলের কিছুই না কাটে।

৬. তাঁর আদর্শ ছিল ঈদগাহে কুরবানী করা।”[95]

৭. তাঁর আদর্শ ছিল একটি ছাগল এক পরিবারের পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে বলে মনে করা, যদিও সংখ্যায় তারা একাধিক হয়ে থাকে।”

(গ) আক্বীকা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:[96]

---

[94] বুখারী, মুসলিম।

[95] বুখারী।

[96] যাদুল মা‘আদ: ২/২৯২।

১. সহীহ্ সনদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন: “প্রত্যেক নবজাত শিশু তার আক্বীকার সাথে দায়বন্ধ থাকে, যেটি তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে যবেহ্ করা হয় এবং তার মাথা-মুণ্ডন করা হয় ও নাম রাখা হয়।”[97]

২. তিনি আরো বলেছেন: “ছেলের পক্ষ থেকে দু’টি ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল যবেহ্ করা হবে।”[98]

---

[97] আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ।

[98] আবু দাউদ ও নাসাঈ।

(১৩) ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেন প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[99]

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয় ও বিক্রয় করেন, তবে নবুওয়াত লাভের পর তাঁর ক্রয় অধিক ছিল বিক্রয় অপেক্ষা, তিনি মজুরী করেন[100] এবং অন্যকে মজুর নিয়োগ করেন, তিনি উকীল-প্রতিনিধি নিয়োগ করেন এবং অন্যের প্রতিনিধিত্ব করেন, তবে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ অধিক ছিল তাঁর প্রতিনিধিত্ব করা অপেক্ষা।

২. তিনি নগদ মূল্যে ও বাকী মূল্যে ক্রয় করেন, তিনি নিজে সুপারিশ করেন এবং তাঁর নিকট সুপারিশকরা হয়, তিনি বন্ধক দিয়ে এবং বন্ধক ছাড়া ঋণ গ্রহণ করেন এবং তিনি ধার নেন।

৩. তিনি দান-খায়রত করেন করেন এবং দান গ্রহণ করেন, তিনি নিজে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করেন এবং উপহার গ্রহণ করেন এবং তার প্রতিদান প্রদান করেন, আর উপহার গ্রহণের ইচ্ছা না হলে প্রদানকারীর নিকট অপারগতা প্রকাশ করেন, রাজা-বাদশাগণ তাঁর নিকট হাদীয়া-উপঢৌকন প্রেরণ করতো, তিনি তাদের হাদীয়া গ্রহণ করতেন এবং তা সাহাবীদের মাঝে বন্টন করে দিতেন।

৪. তাঁর লেন-দেন সর্বাধিক উত্তম ছিল, তিনি কারো থেকে কিছু ঋণ হিসেবে গ্রহণ করলে তার চেয়ে উত্তম পরিশোধ করতেন এবং তার

---

[99] যাদুল মা'আদ: ১/১৫৪।

[100] যেমন মক্কায় কয়েক কীরাতের বিনিময়ে ছাগল-ভেড়া চরানোর ঘটনা।

ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের জন্য বরকতের দু‘আ করতেন, তিনি একবার ঋণ হিসেবে একটি উট গ্রহণ করেন, অতঃপর তার মালিক কর্কশ ভাষায় তাঁর নিকট মূল্য পরিশোধের দাবী করলে সাহাবীগণ তাকে মার-ধর করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি বলেন: তাকে ছেড়ে দাও, কেননা হকদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে।”[101]

৫. অজ্ঞ-মুর্খদের কঠোরতা তাঁর দৈর্ঘ-ক্ষমাশীলতাকে আরো বৃদ্ধি করতো, তিনি রাগান্বিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন, সে যেন নিজের রাগের অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে অযুর পানির দ্বারা নিবিয়ে ফেলে এবং বসে পড়ে যদি সে দাঁড়ানো থাকে এবং শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে।

৬. তিনি কারো উপর গর্ব-অহংকার করতেন না, বরং সাথীদের সামনে বিনয় নম্রতা প্রকাশ করতেন এবং ছোট-বড় সবাইকে সালাম দিতেন।

৭. তিনি কখনো কৌতুক ও রসিকতা করতেন, তবে তিনি কৌতুক ও রসিকতায় সত্য বলতেন, তিনি কখনো ‘তাওরিয়া’ বা ইঙ্গিতে কথা প্রকাশ করতেন, তবে তিনি তাতে সত্য ছাড়া বলতেন না।

---

[101] বুখারী ও মুসলিম।

৮. তিনি একদা নিজেই দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন, নিজ হাতেই জুতা সেলাই করেন, নিজ হাতেই কাপড় বহন করেন, পানির ঢোলে তালি লাগান, ছাগলের দুধ দোহন করেন, কাপড় সেলাই করেন, নিজের ও পরিবার-পরিজনের খেদমত করেন এবং সাহাবীদের সঙ্গে মসজিদে নির্মাণ কাজে ইট বহন করেন।

৯. তাঁর বক্ষ কল্যাণের জন্য সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক উন্মুক্ত ছিল, তাঁর অন্তর সর্বাধিক পবিত্র ছিল।

১০. তাঁকে দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দেওয়া হলে তিনি সর্বদাই অপেক্ষাকৃত সহজতরটি গ্রহণ করতেন, যদি না হয় তা গুনাহর বিষয়।

১১. তিনি ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, তবে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হলে শুধু আল্লাহর জন্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। ১২. তিনি পরামর্শ দিতেন এবং পরামর্শ গ্রহণ করতেন, রোগীর দেখা-শুনা করতেন এবং জানাযায় শরীক হতেন, লোকদের দাওয়াত গ্রহণ করতেন এবং বিধবা, অভাবগ্রস্ত দুর্বলদের অভাব পূরণের লক্ষ্যে তাদের সাথে হেঁটে যেতেন।

১৩. কেউ তাঁকে পছন্দনীয় কোনো বস্তু উপহার দিলে তিনি তার জন্য দু'আ করতেন এবং বলতেন: যে কেউ কারো প্রতি সদাচরণ করলো, অতঃপর সে ঐ আচরণকারীকে বললো:

«جزاك الله خيراً».

‘জাযাকা-ল্লাহু খাইরান’

“আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুক, তাহলে সে তার অত্যধিক প্রশংসা করেছে।”[102]

[102] তিরমিযী।

(১৪) বিবাহ-শাদী ও পারিবারিক জীবন-যাপন প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[103]

১. সহীহ্ সনদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন: দুনিয়ার বস্তুসমূহ হতে নারী ও সুগন্ধিকে আমার নিকট পছন্দনীয় করা হয়েছে এবং সালাতের মধ্যে আমার চোখের প্রশান্তি রাখা হয়েছে।”[104]

তিনি আরো বলেছেন: “হে যুব সমাজ ! তোমাদের মধ্যে যে সাধ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে।”[105]

তিনি আরো বলেছেন: “তোমরা অত্যধিক মমতাময়ী ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারী বিবাহ করো।”[106]

২. তাঁর আদর্শ ছিল স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার ও মহৎ চরিত্রময় জীবন-যাপন করা। তিনি বলতেন: “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে নিজের পরিবারের নিকট সর্বোত্তম, আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।”[107]

---

[103] যাদুল মা‘আদ: ১/১৪৫।

[104] নাসাঈ।

[105] বুখারী, মুসলিম।

[106] আবু দাউদ।

[107] তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।

৩. স্ত্রীদের কেউ অবৈধ নয় এমন কোনো বিষয় কামনা করলে তিনি তার সে বাসনা পূরণ করতেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার নিকট আনসারী মেয়েদেরকে গোপনে প্রবেশ করাতেন, যারা তাঁর সাথে খেলা-ধুলা করতো। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা পান করার পর তিনি পাত্র হাতে নিয়ে সে স্থানে মুখ রেখে পান করেন যেখানে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা মুখ রেখে পান করেছিলেন, তিনি কখনো কখনো তার কোলে ঠেস লাগাতেন এবং কখনো তাঁর মাথা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর কোলে রেখে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, অথচ কখনো তিনি হায়েয অবস্থায় হতেন, আবার কখনো তাকে হায়েয অবস্থায় পায়জামা পরিধান করতে আদেশ করতেন, অতঃপর তিনি পায়জামার উপর সহবাস করতেন।

৪. তিনি আসরের সালাত শেষে তাঁর স্ত্রীদের নিকট গমন করে তাদের খোজ-খবর নিতেন, অতঃপর রাতে যার পালা তার সাথে রাত্রি যাপন করতেন।

৫. তিনি স্ত্রীগণের মাঝে রাত যাপন এবং খোর-পোষ সমান করে বন্টন করতেন, কখনো কখনো তিনি তাঁর কোনো এক স্ত্রীর প্রতি হাত প্রসারিত করতেন অন্য স্ত্রীদের উপস্থিতিতে।

৬. তিনি স্ত্রীদের সাথে রাতের শেষভাগে ও প্রথমভাগে যৌন-মিলন করতেন, আর রাতের প্রথমাংশে স্ত্রী-সহবাস করলে কখনো গোসল করে ঘুমিয়ে যেতেন, আবার কখনো অযু করে ঘুমিয়ে পড়তেন।

তিনি বলেন: “সে ব্যক্তি অভিশপ্ত বা আল্লাহর রহমত থেকে বহিষ্কৃত, যে নিজের স্ত্রীর পশ্চাতভাগ দিয়ে যৌনসঙ্গম করে।”[108] তিনি আরো বলেন: “তোমাদের কেউ যদি স্ত্রী-সহবাসের পূর্বে বলে:

«اللَّهُمَّ جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا».

‘আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শায়ত্বা-না, ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মিম্মা রাযাক্বতানা।

“হে আল্লাহ! তুমি আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখো, আর আমাদেরকে তুমি (এ মিলনের ফলে) যে সন্তান দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখো। তাহলে যদি সে মিলনের মাধ্যমে সন্তান গর্ভধারণ নির্ধারিত থাকে, তবে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারবে না।”[109]

৭. তিনি বলেন: যখন তোমাদের কেউ কোনো নারীকে বিবাহ করে অথবা দাসক্রয় করে কিংবা চতুষ্পদ জন্তু ক্রয় করে, তখন তার ললাট ধারণ করে ‘বিসমিল্লাহ্’ বলে এবং আল্লাহর নিকট তাতে বরকতের জন্যে দু‘আ করে বলে:

«اللَّهُمَّ إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلت عليه».

---

[108] আবু দাউদ।

[109] বুখারী, মুসলিম।

“আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা, ওয়া খাইরামা জুবিলাত্ আলাইহি, ওয়া আয়ুযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররিমা জুবিলাত্ আলাইহি।”

“তোমার নিকট এর কল্যাণের প্রার্থনা জানাই এবং তার সেই কল্যাণময় স্বভাবেরও আহ্বান জানাই যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর আমি তোমার আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হতে এবং তার প্রবৃত্তির অকল্যাণ হতে যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।”[110]

৮. তিনি বিবাহিতদের জন্যে দু‘আ করে বলতেন:

«بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير».

‘বারকাল্লাহু লাকা, ওয়া বারাকা ‘আলাইকা, ওয়া জামা‘আ বাইনাকুমা ফী খাইরিন।”

“আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিন, আর তোমার উপর বরকত নাযিল হোক এবং তোমাদের দু’জনকে কল্যাণে একত্রিত করুন।”[111]

---

[110] আবু দাউদ, ইবন মাজাহ।

[111] আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।

৯. তিনি সফরকালে স্ত্রীদের মাঝে লটারী দিতেন, লটারীতে যার নাম উঠতো সে তাঁর সঙ্গে যেতো, অন্যদের জন্য সেই সময়টি গণনা করতেন না।

১০. তাঁর আদর্শ ছিল না গৃহ-বাসভবনের প্রতি অতিশয় মনোযোগ প্রদান করা, উচ্চতা বিশিষ্ট-দীর্ঘ করা, সাজিয়ে-নক্স করা এবং সম্প্রসারিত করা।

১১. তিনি[112] তালাক প্রদান করেছিলেন, অতঃপর তালাক প্রত্যাহার করে নেন, তিনি নিজের স্ত্রীদের নিকট এক মাস গমণ করবেন না বলে শপথ করে ঈলায়ে মুয়াক্কাত (বা নির্ধরিত সময়ের ঈলা) করেন, তবে তিনি কখনই ‘যিহার’ করেন নি।”[113]

---

[112] কোনো কোনো স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেছিলেন।

[113] শরীয়াতের পরিভাষায় ‘যিহার’ মানে কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এ কথা বলা যে, তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায়-হারাম, এটা তালাক অপেক্ষা কঠোরতর। অনুবাদক।

(১৫) পানাহার প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[114]

(ক) আহার প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালার বিবরণ:

১. যা কিছু খাবার উপস্থিত করা হতো তা তিনি ফিরিয়ে দিতেন না, আর যা কিছু মওজুদ নেই তার জন্য ভনিতা বা কৃত্রিমতা করতেন না, বরং পবিত্র-হালাল বস্তুসমূহ হতে যা কিছু তাঁর সামনে পেশ করা হতো তা থেকে খেয়ে নিতেন। কিন্তু তাঁর রুচিসম্মত না হলে হারাম না বলে তা পরিত্যাগ করতেন, রুচিসম্মত না হওয়া সত্ত্বেও কোনো কিছু নিজের উপর জরবদস্তি করে খেতেন না। তিনি কখনই কোনো খাবারে দোষ প্রকাশ করেন নি, খাবার তাঁর রুচিসম্মত হলে খেয়েছেন, আ রুচিসম্মত না হলে পরিত্যাগ করেছেন, যেমন তিনি অভ্যস্ত না হওয়ায় 'দ্বাব্ব'[115] খাননি।

২. যা কিছু মওজুদ থাকতো তা হতে তিনি আহার করতেন, আর কিছুই না পেলে তিনি ধৈর্যধারণ করতেন, এমনকি তিনি ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বাঁধেন, এক চাঁদ, দু'চাঁদ ও তিন চাঁদ অতিবাহিত হতো, কিন্তু তার ঘরে আগুন প্রজ্বলন করা হতো না।

৩. তাঁর আদর্শ ছিল না যে, নিজেকে একই প্রকার খাবারের উপর অভ্যস্ত করে নেওয়া এমনভাবে যে, তা ছাড়া অন্য কিছুই খাবেন না।

---

[114] যাদুল মা'আদ ১/১৪২।

[115] বা ষাণ্ডা জাতীয় এক প্রকার প্রাণী।

৪. তিনি ভেঁড়া, দুম্বা ও মুরগীর গোশ্‌ত এবং হুবারা পাখির গোশ্‌ত, জঙ্গলী গাধার গোশ্‌ত, খারগোশ ও সামুদ্রিক খাদ্য এবং ভূনা খাদ্য খেয়েছেন। কাঁচা খেজুর ও শুকনা খেজুর খেয়েছেন। তিনি 'সারীদ'- অর্থাৎ গোশ্‌ত ও রুটি মেশানো এক প্রকার উপাদেয় খাবার খেয়েছেন। তিনি যায়তুনের তৈল দিয়ে রুটি খেয়েছেন। তিনি তাজা খেজুরের সাথে খিরা খেয়েছেন। তিনি রান্নাকৃত কদু খেয়েছেন এবং তিনি সেটি পছন্দ করতেন। তিনি ডেকচিতে অবশিষ্ট শুকনা গোশতের টুকরো খেয়েছেন এবং তিনি দুধের সর দিয়ে খেজুর খেয়েছেন।

৫. তিনি গোশ্‌ত পছন্দ করতেন এবং তাঁর নিকট অত্যধিক পছন্দনীয় ছিল বকরীর বাহু ও অগ্রবর্তী অংশ।

৬. তিনি স্বদেশের নবাগত ফল খেতেন এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করতেন না।

৭. অধিকাংশ সময় তাঁর খাবার যমীনের উপর দস্তরখানে রাখা হতো।

৮. তিনি ডান-হাতে আহার করার নির্দেশ দিতেন এবং বাম-হাতে খেতে নিষেধ করতেন। এবং বলতেন: "শয়তান বাম-হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে।"[116]

---

[116] মুসলিম।

৯. তিনি তিন আঙ্গুলে আহার করতেন এবং তিনি আহার শেষে আঙ্গুল চেটে খেতেন।”[117]

১০. তিনি হেলান দিয়ে খাবার খেতেন না।”[118]

আর হেলান বা ঠেস্ লাগানো তিন প্রকারে হয়ে থাকে : - ১. একপার্শ্বে ঝুঁকে আহার করা, ২. চারজানু হয়ে বসে আহার করা, ৩. এক হাতের উপর ঠেস্ দিয়ে বসে অপর হাতে আহার করা, উক্ত তিন প্রকারই নিন্দিত। তিনি উভয় হাঁটু খাড়া অবস্থায় পাছার উপর বসে আহার করতেন এবং বলতেন: “আমি বসি যেভাবে একজন দাস বসে আর আহার করি যেভাবে একজন দাস আহার করে।

১১. যখন তিনি খাবারে হাত রাখতেন তখন

«بسم الله».

‘বিসমিল্লাহ্’ বলতেন এবং তিনি আহারকারীকে ‘বিসমিল্লাহ্’ বলার নির্দেশ দিতেন, তিনি আরো বলেন: “যখন তোমাদের কেউ খাবার খায় তখন শুরুতে যেন ‘বিসমিল্লাহ্’ বলে, আর যে শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ্’ বলতে ভুলে গেলো সে যেন বলে:

«بسم الله في أوله وآخره»

---

117 মুসলিম।

118 বুখারী।

‘বিসমিল্লাহি ফী আওয়ালিহী ওয়া আখিরীহী।”

“শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নামে।”[119]

১২. তিনি বলেন: “যে খাবারে আল্লাহর নাম নেয়া হয় না, শয়তান তাকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়।”[120]

১৩. তিনি খাবার খেতে বসে মেহমানদের সাথে কথা বলতেন এবং তাদের উপর বারংবার খাবার উঠিয়ে দিতেন, যেমনটি অতি আপ্যায়ণকারী লোকেরা করে থাকে।

১৪. যখন তার সামনে থেকে খাবার খাওয়ার পর বাকী অংশ উঠিয়ে নেওয়া হতো তখন তিনি বলতেন:

«الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا».

‘আল-হামদু লিল্লাহি হামদান কাসিরান ত্বাইয়েবান মুবারাকান ফীহি, গাইরা মুকফিয়্যীন, ওয়ালা-মুয়াদ্দা‘য়ীন, ওয়ালা-মুসতাগনান ‘আনহু রাব্বানা।”

“পাক-পবিত্র, বরকতময় অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহর জন্য, হে আমাদের প্রভু! যে খাদ্য হতে নির্লিপ্ত হতে পারবো না, আর যা থেকে

---

[119] তিরমিযী।

[120] মুসলিম।

কখনই চিরতরে বিদায় নিতে পারবো না এবং তা হতে অমুখাপেক্ষীও হবো না।”[121]

১৫. তিনি কারো নিকট পানাহার করলে তাদের জন্যে দু‘আ না করা পর্যন্ত বের হতেন না এবং বলতেন:

«أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة».

‘আফতারা ইন্দাকুমুস সায়েমূন, ওয়া-‘আকালা ত্বা‘আমাকুমুল আবরার, ওয়া-স্বাল্লাত্ আলাইকুমুল মালাইকা।”

“তোমাদের সাথে ইফতার করলো রোযাদারগণ, তোমাদের আহার গ্রহণ করলো সৎ লোকগণ এবং তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করলো ফেরেশতাগণ।”[122]

১৬. যদি কেউ মিসকীন-অভাবগ্রস্ত লোকদের মেহমানদারী করতো তিনি তার জন্যে দু‘আ করতেন এবং তার প্রশংসা করতেন।

১৭. তিনি ছোট কিংবা বড়, স্বাধীন কিংবা ক্রীতদাস, বেদুঈন কিংবা মুহাজির বা ভিনদেশী যে কারো সাথে বসে পানাহার করতে ঘৃণা করতেন না।

---

[121] বুখারী।

[122] আবু দাউদ।

১৮. রোযারত অবস্থায় তাঁর সামনে খাবার পেশ করা হলে তিনি বলতেন: আমি রোযাদার।”[123] এবং মেহমানের প্রতি নির্দেশ জারী করেন যে, যদি সে রোযাদার হয়, তাহলে যেন মেজবানের জন্যে দু‘আ করে, আর যদি সে রোযাদার না হয় তাহলে যেন আহার করে।”[124]

১৯. কেউ বিশেষভাবে খাবার তৈরী করে তাঁকে দাওয়াত দিলে, তখন তার সাথে অন্য কেউ এসে শামিল হলে, তিনি মেজবানকে তার সম্পর্কে অবহিত করে বলতেন: এই ব্যক্তি আমাদের সাথে এসেছে, তোমার ইচ্ছা হলে তাকে অনুমতি দিতে পার, নতুবা তুমি চাইলে সে চলে যাবে।”[125]

২০. সাহাবীদের কেউ কেউ তাঁর নিকট অভিযোগ করলো যে, তারা পানাহার করে পরিতৃপ্তি লাভ করে না, তখন তিনি তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে না হয়ে একত্রে খাবার খাও এবং আল্লাহর নাম নিবে, এতে তোমাদের খাদ্যে বরকত হবে।”[126]

২১. তিনি বলেছেন : “আদম-সন্তান পেটের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করেনি, তার জন্যে কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ট ছিল,

---

[123] বুখারী, মুসলিম।

[124] মুসলিম।

[125] বুখারী।

[126] আবু দাউদ।

যদ্বারা স্বীয় পিঠ সোজা রাখবে, আর অত্যধিক প্রয়োজন হলে এক - তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য।”[127]

২২. এক রাত্রে তিনি ঘরে প্রবেশ করে খাবার তালাশ করে কিছুই পেলেন না, তখন তিনি বললেন:

«اللَّهُمَّ أطعم من أطعمني واسق من سقاني».

‘আল্লা-হুম্মা আত্বয়িম মান আত্বআমানী, ওয়াসকি মান-সাক্কানী।”

“হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাবে তুমি তাকে আহার করাও, আর যে আমাকে পান করাবে তুমি তাকে পান করাও।’[128]

(খ) পান করা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালার বিবরণ[129]

১. পান করা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ছিল সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ, যাতে স্বাস্থ্যের হেফাযত হয়। ঠান্ডা-মিষ্টি পানীয় তাঁর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল। তিনি কখনো খালেস দুধ পান করতেন, আবার কখনো পানি-মিশ্রিত দুধ, তিনি দুধ পান করে বলতেন:

«اللَّهُمَّ بارك لنا فيه وزدنا منه».

---

[127] তিরমিযী, ইবন মাজাহ।

[128] মুসলিম।

[129] যাদুল মা‘আদ ২/৩৬৬; ৪/২০৯।

'আল্লা-হুম্মা বারিক লানা-ফিহ্, ওয়াযিদনা-মিনহু,

"হে আল্লাহ্ ! তুমি আমাদের এ খাদ্যে বরকত দাও এবং তা আরো বেশী করে দাও, নিঃসন্দেহে এমন কোনো বস্তু নেই যা খানা-পিনার জন্য যথেষ্ট হতে পারে একমাত্র দুধ ব্যতীত।"[130]

২. খাবারের উপর পান করা তাঁর আদর্শ ছিল না, তাঁর জন্যে রাতের প্রথমভাগে 'নবীয' বানানো হতো এবং তিনি তা সকালে এবং আগামী রাতে এবং দ্বিতীয় দিনে ও রাতে এবং তৃতীয় দিন আসর পর্যন্ত পান করতেন, অতঃপর অবশিষ্টগুলি খাদেমকে পান করাতেন অথবা ঢেলে দিতে নির্দেশ দিতেন।

'নাবীয' মানে পানিতে পাকা খেজুর ঢেলে রেখে তা মিষ্টি করা, তিন দিন পর নেশাদ্রব্যে পরিণত হওয়ার আশঙ্কায় তিনি তা পান করতেন না।

৩. তাঁর অভ্যাসগত আদর্শ ছিল বসাবস্থায় পান করা এবং যে দাঁড়ানো অবস্থায় পান করে তাকে তিনি ধমক দেন, তবে তিনি একদা দাঁড়ানো অবস্থায় পান করেন, কেউ বলেন: তা বিশেষ প্রয়োজনে ছিল, আর কেউ বলেন: নিষেধাজ্ঞা রহিত করার জন্য ছিল, আবার কেউ বলেন : উভয়টি জায়েয ঘোষণা করার জন্য ছিল।

---

[130] তিরমিযী।

৪. তিনি পানি পান করতে তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন এবং বলতেন: “এটি অধিক তৃপ্তিদায়ক, অধিক হযমকারী এবং অধিক উপকারী।”[131] এখানে তিনি তিনবার ‘নিঃশ্বাস নিতেন’ এর অর্থ হচ্ছে, তিনি পাত্রের বাইরে নিঃশ্বাস ফেলতেন, যেরূপ অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছেন: “যখন তোমাদের কেউ পান করে তখন যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে, বরং নিঃশ্বাস ফেলার সময় মুখ থেকে পাত্র সরিয়ে নিবে।”[132] তিনি পাত্রের ফাটল দিয়ে কিংবা মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫. আর তিনি ‘আল-হামদুলিল্লাহ্’ বলতেন যখন পান শেষ করতেন এবং বলেন: “নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই বান্দার উপর রাযী হন যে খাবার আহার করলে ‘আল-হামদুলিল্লাহ্’- বলে এবং পানীয় পান করলে ‘আল-হামদুলিল্লাহ’, বলে।”[133]

৬. তাঁর জন্যে মিষ্টি পানি আনা হতো, ভাল-উত্তম পানি যা লবণাক্ত নয় এবং তা থেকে তিনি গতকালের পুরানোটি গ্রহণ করতেন।

৭. তিনি পান করার পর অবশিষ্ট অংশ ডানে উপস্থিত ব্যক্তিকে দিতেন যদিও তাঁর বামে কোনো প্রবীণ ব্যক্তি থাকে।

---

[131] মুসলিম।

[132] তিরমিযী, ইবন মাজাহ।

[133] মুসলিম।

৮. তিনি খাবার পাত্র ঢেকে রাখতে এবং মুখ বন্ধ করতে নির্দেশ দিতেন, যদিও এক টুকরা কাঠ দিয়ে হয় এবং যেন সে সময় ‘বিসমিল্লাহ্’ বলা হয় সে নির্দেশনা দিতেন।”

(১৬) ইসলামের দাওয়াত প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালার বিবরণ[134]

১. তিনি দিনে ও রাত্রে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন, তিনি নবুওয়াতের প্রথমভাগে তিন বছর মক্কায় গোপনীয়ভাবে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করেন, অতঃপর আল্লাহর বাণী:

﴿ فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ۝٩٤ ﴾ [الحجر: ٩٤]

“তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছো, তা প্রকাশ্যে প্রচার করো এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর।”[135] এই আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগ আরম্ভ করেন এবং আল্লাহর পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করেন নি, বরং ছোট -বড়, স্বাধীন-ক্রীতদাস, নারী-পুরুষ ও জ্বিন-ইনসান সবাইকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন।

২. মক্কায় তাঁর সাহাবীদের উপর নিপীড়ন কঠোরতর হয়ে উঠলে তিনি তাদেরকে হাবশায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন।

৩. তিনি তায়েফ গমন করেন এ আশায় যে, তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর সাহায্য করবে, তাই তিনি সেখানে পৌঁছে তাদেরকে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেন, কিন্তু তিনি সাহায্য-সহযোগিতাকারীরূপে

---

[134] যাদুল মা‘আদ: ৩/১১-৪৪।

[135] সূরা হিজর, আ: ৯৪।

কাউকে পেলেন না, বরং তারা তাঁকে সর্বাপেক্ষা কঠিন কষ্ট দিলো এবং তারা তাঁর সাথে এরূপ মন্দ আচরণ করলো যা তিনি তাঁর নিজের কাওম থেকেও পান নি। অবশেষে তারা তায়েফ থেকে তাঁকে মক্কার দিকে বহিষ্কার করলো, অতঃপর তিনি মুত‘আম ইবনে আদীর আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন।

৪. তিনি মক্কায় দশ বছর পর্যন্ত প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন, তিনি প্রত্যেক বছর হজ্জের মৌসুমে নতুন উদ্যমে ইসলামের দাওয়াত শুরু করতেন এবং হাজীদের তাঁবুতে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং ‘ওকায, মাজিন্নাহ ও যিল-মজায’ প্রভৃতি মেলা মৌসুমে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, এমনকি তিনি আরবের বিভিন্ন গোত্র ও তাদের অবস্থান-স্থল প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাতেন।

৫. অতঃপর মিনার পাহাড়ী এলাকার ‘আকাবা’য় মদীনার ‘খাযরাজ’ গোত্রের ছয় জন লোকের সাথে দেখা হয়, তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়, অতঃপর তারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে লোকদেরকে ইসলামের পথে দাওয়াত দিতে থাকে, ফলে মদীনার ঘরে ঘরে দ্বীনের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে, বস্তুত মদীনায় এমন কোনো ঘর বাকী ছিল না যাতে ইসলাম প্রবেশ করেনি।

৬. পরবর্তী বছর হজ্জ মৌসুমে তাদের ১২ জন লোক আসে, তিনি তাদেরকে মিনার ‘আকাবা’র কাছে বাই‘আত চান। তারা আল্লাহর

রাসূলের নিকট বাই‘আত করেন। সে বাই‘য়াতের দফাসমূহ ছিল: তারা তাঁর কথা শুনবে এবং মানবে, তাঁর জন্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করবে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে বারণ করবে, আল্লাহর জন্য দাওয়াতের কথা বলবে, এ ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া তারা করবে না, তারা তাঁর সাহায্য করবে এবং নিজেদের প্রাণ, সন্তান-সন্তুতি এবং পরিবারের হেফযতের মতোই তাঁর হেফাযত করবে এবং পুরষ্কার স্বরূপ তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। অতঃপর তারা মদীনায় ফিরে যায়, তখন তিনি তাদের সাথে ‘আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতূম ও মুস্‘আব ইবনে ওমাইর, রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা-কে কুরআন শিক্ষা ও আল্লাহর দিকে দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের জন্যে মদীনায় প্রেরণ করেন, ফলে তাদের দাওয়াতে অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উছাইদ ইবনে হুদাইর ও সা‘দ ইবনে মু‘আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা।

৭. অতঃপর তিনি মুসলিমদের মদীনায় হিজরত করে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন, তখন মুসলিমগণ দ্বীন রক্ষার্থে জন্মভুমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত শুরু করে, অবশেষে তিনি ও তাঁর সাথী আবু বকর হিজরত করেন।

৮. তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। তখন তাদের সংখ্যা ছিল ৯০ জন পুরুষ।”

(ক) শান্তিচুক্তি-সন্ধি, নিরাপত্তা প্রদান ও দূতদের সাথে ব্যবহার প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[136]

১. সহীহ্ সনদে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "সকল মুসলিমের অঙ্গীকার জনিত দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ একই ধরনের। ফলে তাদের সাধারণ ব্যক্তিরাও তা মেনে চলতে বাধ্য। অর্থাৎ একজন কোনো অঙ্গীকার বা চুক্তি করলে সকলে তা মেনে চলবে।"[137] তিনি আরো বলেন: "যার সাথে কোনো জাতির সন্ধি-চুক্তি রয়েছে, সে যেন চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া অবধি চুক্তি ভঙ্গ না করে। আর সে যেন সে সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনোভাবেই তার ব্যতিক্রম না করে। অথবা সন্ধি-চুক্তি তাদের দিকে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলে যেন সে ও অপরপক্ষ এতে সমান সমান হয়ে যায়।"[138] তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো লোককে তার জানের নিরাপত্তা দেওয়ার পর তাকে হত্যা করল, আমি সে হত্যাকারীর সাথে সম্পর্কছিন্নকারী।"[139]

৩. যখন 'মুছাইলামাতুল কায্যাব-এর দু'জন দূত তাঁর নিকট এসে তার ব্যাপারে কথা-বার্তা বললো, তখন তিনি বলেন: "যদি না নিয়ম হচ্ছে দূতদেরকে হত্যা করা হয় না, নচেৎ আমি তোমাদের উভয়ের

---

[136] যাদুল মা'আদ: ৩/১১২।

[137] বুখারী, মুসলিম।

[138] আবু দাউদ, তিরমিযী।

[139] ইবনে মাজাহ্।

গর্দান উড়িয়ে দিতাম।”[140] তাই তাঁর আদর্শ এভাবে জারী হয় যে, কোনো প্রেরীত- দুতকে হত্যা না করা।” সে থেকে রাসূলের নিয়ম চলে আসছে যে, কোনো দূতকে হত্যা করা হয় না।

৪. কোনো প্রেরিত দূত তাঁর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করলে, তিনি তাকে বাধা দিয়ে রেখে দিতেন না, বরং তাকে স্বদেশে ফিরিয়ে দিতেন।

৫. সাহাবীদের কেউ তাঁর অনুমতি ছাড়া শত্রুদের সাথে এমন কোনো সন্ধি-চুক্তি করলে যাতে মুসলিমদের কোনো ক্ষতি নেই, তখন তিনি তা অনুমোদন করে দিতেন।

৬. তিনি কুরাইশদের সাথে দশ বছর যাবৎ যুদ্ধ বন্ধের উপর শান্তি - চুক্তি করেন এ শর্তে যে, কুরাইশদের কোনো লোক মুসলিম হয়ে তাঁর নিকট আসলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন, কিন্তু তাঁর নিকট থেকে কেউ আশ্রয় লাভের জন্যে কুরাইশদের নিকট চলে গেলে তারা তাকে ফেরত পাঠাবে না, তবে আল্লাহ্ তাআলা মুহাজির মহিলাদেরকে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি রহিত করে দেন এবং তাদেরকে পরীক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করেন, ফলে যে মু'মিনা বলে জানতে পারা যাবে, তাকে কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠানো হবে না।[141]

---

[140] আবু দাউদ।

[141] “এই প্রসঙ্গে সূরা মুমতাহিনার ১০-১৩ নং আয়াত নাযিল হয়।” অনুবাদক

৭. তিনি মুসলিমদের প্রতি এ মর্মে নির্দেশ জারী করেন, যে নারী মুসলিম হয়ে হিজরত করে মদীনায় এসে যায়, তার কাফের স্বামী মাহর হিসেবে যা কিছু তার পিছনে ব্যয় করেছে, তা তাকে ফেরত দেওয়া হবে, আবার মুসলিমের স্ত্রী কাফেরদের নিকট চলে গেলে অনুরূপ মুসলিম স্বামীদেরকে মাহর ইত্যাদি ফেরত দেওয়া কাফেরদের উপর জরুরী ছিল। কিন্তু কাফেরগণ যদি তা ফেরত না দেয় এবং মুসলিমগণ এর প্রতিশোধ নিতে চায়, তবে কাফেরদের প্রাপ্য মাহর মুসলিমদের প্রাপ্য পরিমাণে আটক করে আটককৃত মাহর থেকে মুসলিম স্বামীকে তার ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ দেওয়া হবে।

৮. কুরাইশদের কোনো পুরুষ মুসলিম হয়ে তাঁর কাছে চলে আসলে, অতঃপর হোদায়বিয়ার শর্তানুযায়ী তারা তাকে ধরে নিতে আসলে তিনি তাদেরকে বাধা দিতেন না, তবে ফেরত যাওয়ার জন্য আগন্তুক ব্যক্তির উপর না জবরদস্তি করতেন, আর না ফেরত যাওয়ার আদেশ দিতেন। যদি কোনো নির্যাতিত মুসলিম তাদের কাউকে হত্যা করে কিংবা তাদের মাল লুণ্ঠন করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হতো এবং এসে তাঁর সাথে মিলিত না হতো, তখন তিনি তাতে অসম্মতি প্রকাশ করতেন না এবং কুরাইশদের জন্য তিনি তার জিম্মাদার হন নি।[142]

৯. তিনি খায়বরবাসীদের সাথে সন্ধি-চুক্তি করেন যখন তিনি তাদের উপর যুদ্ধে বিজয়ী হন এ শর্তে যে, তারা খায়বর নগরী হতে বহিষ্কৃত

---

[142] "যেমন আবু বছির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও তার সঙ্গীদের ঘটনা।" অনুবাদক।

হবে এবং নিজেদের সাথে সাওয়ারীর উপর যতটা সম্ভব ধন-সম্পদ নিয়ে যাবে, তবে স্বর্ণ-রূপা ও সমরাস্ত্র আল্লাহর রাসূলের জন্য রেখে যাবে।

১০. তিনি খায়বরের কৃষিভূমি এই শর্তে সেখানকার অধিবাসী ইয়াহূদীদেরকে বর্গা-বন্দোবস্ত দেন যে, তারা এতে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করবে, বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক লাভ করবে এবং তিনি যতোদিন চাইবেন তাদেরকে খায়বরে থাকার সুযোগ দেবেন, আবার যখনই তিনি ইচ্ছা করবেন তাদেরকে বহিষ্কার করবেন, তাই তিনি প্রত্যেক বছর উৎপন্ন ফসলাদি অনুমান করে বন্টন করার জন্য লোক প্রেরণ করতেন, সে অনুমান করে মুসলিমদের অংশ নির্ধারণ করে নিতো এবং ইয়াহূদীরা তাদের অংশ নিয়ে নিতো।”

(খ) রাজা-বাদশাহ ও আমীরদেরকে ইসলামের দাওয়াত এবং তাঁদের প্রতি দূত ও চিঠি প্রেরণ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[143]:

১. রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও আমীরদের নামে চিঠি পাঠান এবং তাদের প্রতি দূত প্রেরণ করেন। তিনি রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের প্রতি দাওয়াতী পত্র পাঠান এবং দেহইয়াতুল কালবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন, ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু পরিশেষে ইসলাম গ্রহণ করেনি।

---

[143] যাদুল মা‘আদ’ ৩/১৪১।

২. তিনি হাবশার বাদশাহ নাজাশীর প্রতি চিঠি ও দূত প্রেরণ করেন, ফলে বাদশাহ্ নাজাশী ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন।

৩. তিনি আবু মূসা আশ্'আরী ও মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে ইসলামের দাওয়াতের জন্যে 'ইয়ামেন দেশে' প্রেরণ করেন, ফলে তাঁদের দাওয়াতে অধিকাংশ ইয়ামেনবাসী স্বেচ্ছায় যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করে।"

(গ) মুনাফিকদের প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[144]:

১. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রকাশ্য অবস্থাকে গ্রহণ করতেন এবং গোপনীয় রহস্যকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করতেন, তাদের বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণ দিয়ে জেহাদ করতেন, তাদেরকে উপেক্ষা করে চলতেন, তাদের প্রতি কঠোরতা করতেন এবং তাদের সাথে হৃদয়স্পর্শী কথা বলতেন।

২. তিনি তাদের অন্তঃকরণ নিজের দিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে তাদের হত্যা করেননি, ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এক মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিতে চাইলে তিনি উত্তরে বলেন : না, লোকেরা যেন একথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মাদ তো নিজের সাথীদেরকে হত্যা করছে।"[145]

---

[144] যাদুল মা'আদ, ৩/১৪৩।

[145] বুখারী ও মুসলিম।

(১৭) আল্লাহর যিকর প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[146]

আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহুর যিকর প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ছিল সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ, বরং তাঁর প্রতিটি কথা-বার্তা ছিল আল্লাহর যিকর ও তাঁর পছন্দনীয় বিষয়ে। উম্মতের প্রতি তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করা ছিল তাঁর পক্ষ থেকে আল্লাহর যিকরের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর চুপ থাকা ছিল অন্তরে আল্লাহর যিকর, সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বাস-প্রশ্বাসে, উঠা-বসা ও শায়িত, চলা-ফেরা, সফর-ইকামা সকল অবস্থায়ই আল্লাহুর যিকর জারী ছিল।"

(ক) সকাল-সন্ধায় আল্লাহর যিক্‌র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[147]:

১. তিনি সকালে বলতেন:

«أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد ﷺ وملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان مِنَ المشركين»

'আস্বাহনা 'আলা-ফিৎরাতিল ইসলাম, ওয়া-'আলা কালিমাতিল ইখলাস্ব, ওয়া-আলা দ্বীনে নবীয়্যিনা মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওয়া-'আলা মিল্লাতে আবীনা ইবরাহীমা হানীফাম মুসলিমান, ওয়ামা-কানা মিনাল মুশরিকিন।"

---

[146] যাদুল মা'আদ : ২/৩৩২।

[147] যাদুল মা'আদ : ২/৩৩২।

“আল্লাহর অনুগ্রহ আমরা প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিৎরাতের উপর ও ইখলাসের বাণীর উপর এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনের উপর, আমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর মিল্লাতের উপর, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।”[148]

তিনি আরও বলতেন,

«اللَّهُمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا ونموت وإليك النشور»

“আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা, ওয়াবিকা আমসাইনা, ওয়াবিকা নাহইয়া ওবিকা নামূতু, ওয়াইলাইকান নুশূর”।[149]

“হে আল্লাহ, আমরা তোমার সাহায্যে সকালে উপনীত হয়েছি, তোমার সাহায্যে বিকালে উপনীত হয়েছি, তোমার সাহায্যে জীবিত থাকি ও মরি, আর তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন।”

যখন তোমাদের কেউ প্রত্যুষে উপনীত হবে, তখন সে বলবে:

---

[148] মুসনাদে আহমাদ।

[149] আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ।

«أَصْبَحْنَا وأَصْبَحَ المُلْكُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هذا الْيَومِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ ونُورَهُ وَبَرَكَتَه وهِدَايَتَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما فيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، ثُمَّ إِذَا أَمْسَى، فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذلِكَ»

'আস্ববাহনা ওয়া-আস্ববাহাল মুলকু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন, আল্লা-হুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরা হাযাল-ইয়াউমি, ফাতহাহু ওয়া নাসরাহু, ওয়া নূরাহু ওয়া বারাকাতাহু ওয়া হুদাহু, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি মা-ফীহি, ওয়া-শাররি মা বা'দাহু।'

"আল্লাহু রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহে আমরা এবং সকল সৃষ্টিজগত প্রভাতে উপনীত হয়েছি। হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট কামনা করি এই দিনের কল্যাণ, বিজয়, সাহায্য, নূর ও বরকত এবং হেদায়াত, আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এই দিনের এবং এই দিনের পরের অকল্যাণ হতে। অতঃপর যখন সন্ধা হবে অনুরূপ বলবে।"[150]

২. তিনি আরও বলেন: সর্বশ্রেষ্ঠ ইস্তেগফার হলো, বান্দা বলবে:

« اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»

---

[150] আবু দাউদ।

‘আল্লা-হুম্মা আন্তা রাব্বী, লা-ইলাহা ইল্লা-আন্তা, খালাক্বতানী ওয়া-আনা আব্দুকা, ওয়া-আনা ‘আলা-‘আহদিকা ওয়া ওয়া‘দিকা মাস্তাতা‘তু, আউযুবিকা মিন্-শাররি মা সানা‘তু, আবূয়ু লাকা বি-নি‘মাতিকা ‘আলাইয়্যা, ওয়া-আবূয়ু লাকা বিযাম্বী, ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয্যুনূবা ইল্লা আন্তা।”

“হে আল্লাহ ! তুমিই আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া সত্য কোনো মা‘বুদ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমার বান্দা, আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় থাকবো, আমার কৃতকর্মের কু-ফল ও মন্দ পরিণাম হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই, তুমি আমাকে যেসব নে‘আমত দান করেছো আমি তা স্বীকার করছি এবং স্বীকার করছি আমার গুনাহের কথা, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না।

মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন; যে কেউ উক্ত দু‘আটি দিনের বেলায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলে এবং সন্ধা হওয়ার আগেই মারা যায়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি তা রাত্রিবেলায় আন্তরিকতার সাথে বলে এবং সকাল হওয়ার আগেই মারা যায়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[151]

---

[151] বুখারী।

৩. তিনি আরও বলেছেন: যে ব্যক্তি দৈনিক এ দু'আটিকে শতবার পাঠ করবে:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ»

“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু, লা-শারিকালাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হাম্দু, ওয়াহুয়াআলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।”

“আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলাহ বা সত্য মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই জন্যে এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্যে, তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান”, তাহলে সে দশজন দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ পুণ্য লাভ করবে, তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে ও একশত গুনাহ মাফ করা হবে, সে উক্ত দিবসে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের (প্ররোচনা ও বিভ্রান্তি) হতে সুরক্ষিত থাকবে, আর কিয়ামতের দিন তার থেকে উত্তম আমল নিয়ে কেউ আসবে না, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে তার চেয়েও অধিক পরিমাণে আমল করেছে।’[152]’

৪. তিনি সকাল-সন্ধ্যায় এ দু'আ করতেন:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ فِي دينِي ودُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُر عَوْرَاتِي، وآمِنْ رَوْعَاتِي، اللّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ

[152] বুখারী, মুসলিম।

بَيْنِ يَدَيَّ ومِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي»

“আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল ‘আফিয়াতা ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখেরাতে, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল ‘আফিয়াতা ফী দীনী ওয়া দুনইয়া-য়া ওয়া আহলি ওয়া মা-লি, আল্লাহুম্মাসতুর ‘আওরাতী, ওয়া আমিন রাও‘আতী। আল্লাহুম্মাহফাযনী মিন বাইনে ইয়াদাইয়্যা ওয়ামিন খালফী ওয়া ‘আন ইয়ামীনী ওয়ান শিমালী, ওয়ামিন ফাওক্বী, ওয়া আ‘উযু বি ‘আযমাতিকা আন-উগতালা মিন তাহতী”।

“হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি, হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার-পরিজনের এবং আমার ধন-সম্পদের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ ! তুমি আমার দোষ-ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখো এবং আমার চিন্তা ও উদ্বিগ্নতাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রুপান্তরিত করে দাও, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখো আমার সম্মুখের বিপদ হতে এবং পশ্চাদের বিপদ হতে, আমার ডানের বিপদ হতে এবং আমার বামের বিপদ হতে, আর উর্ধ্বদেশের গযব হতে, তোমার মহত্বের দোহাই দিয়ে তোমার নিকট

আশ্রয় কামনা করছি, আমার নিম্নদেশ হতে আগত বিপদ হতে, তথা মাটি ধ্বসে আকষ্মিক মৃত্যু হতে।”[153]

৫. তিনি আরো বলেছেন: যে কেউ এ দু'আটি দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় তিন তিন বার করে পাঠ করে:

«بِسْمِ اللهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شيءٌ في الأرض وَلَا في السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ»

'বিসমিল্লাহিল-লাযী, লা-ইয়াদুররু, মা'আ ইসমিহী সাইয়্যুন, ফিল আরদি ওয়ালা ফিস্-সামায়ি, ওয়া হুয়াস্-সামী'উল আলীম।'

“আমি সেই আল্লাহুর নামে আরম্ভ করছি, যার নামে শুরু করলে আকাশ ও পৃথিবীর কোনো বস্তুই কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। বস্তুত: তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা”, তাহলে কোনো বস্তুই তার কোনোরূপ অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না।”[154]

৬. আবু বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁকে বলেন: আপনি আমাকে শিক্ষা দিন, সকাল-সন্ধ্যায় আমি কোনো দু'আটি পাঠ করবো, তখন জবাবে তিনি বলেন তুমি বলবে:

---

[153] আবু দাউদ, ইবন মাজাহ।

[154] আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।

«اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ والأَرضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شيءٍ وَمَلِيكَهُ ومَالِكه، أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا أنْتَ، أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نفسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه، وَأَنْ أقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ»

“আল্লা-হুম্মা ফা-তিরিস- সামাওয়াতি ওয়াল আরযি, আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ-শাহাদাতি, লা-ইলাহা ইল্লা-আন্তা, রাব্বা কুল্লি-শাইয়্যিন ওয়া মালীকাহ্, আউযুবিকা মিন্-শাররি নাফ্সী, ওয়া-মিন শাররিশ-শায়তানে ওয়া শিরকিহ্, ওয়া আন-আক্বতারিফা ‘আলা-নাফসী সূআন, আউ আজুররুহু ইলা-মুসলিম।

“হে আল্লাহ! তুমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জান, তুমি সকল বস্তুর প্রভু-প্রতিপালক এবং সকল কিছুর মালিক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মা‘বুদ নেই, আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে এবং শয়তান ও তার শির্কের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আর আমি নিজের অনিষ্ট করা হতে এবং কোনো মুসলিমের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।” তিনি আরো বলেন: হে আবু বকর! তুমি সকাল-সন্ধ্যায় এবং তোমার শয়নকালে তা পাঠ করবে।[155]

[155] আবু দাউদ ও তিরমিযী।

(খ) ঘর থেকে বের হওয়া ও ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহর যিক্‌র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:[156]

১. তিনি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন:

«بِسْمِ اللهِ، توكلتُ على اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أوْ أُضَلَّ أَوْ أزلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أو أَجهلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ»

'বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, আল্লা-হুম্মা ইন্নি আ'উযুবিকা আন আদিল্লা আউ উদাল্লা, আযিল্লা আউ উযাল্লা, আযলিমা আউ উযলামা, আজহালা আউ উজহালা 'আলাইয়া।

"আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম, অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎকাজ করার কারো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া; হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি অন্যকে পথভ্রষ্ট করতে অথবা অন্যের দ্বারা আমি পথভ্রষ্ট হতে, আমি অন্যকে পদস্খলন করতে অথবা অন্যের দ্বারা পদস্খলিত হতে, আমি অন্যকে অবজ্ঞা করতে অথবা নিজে অপরের দ্বারা অবজ্ঞা হওয়া থেকে।"[157]

২. তিনি আরো বলেন: যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বললো:-

---

[156] যাদুল মা'আদ : ২/৩৩৫।

[157] তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্।

«بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ولا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ»

“বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলা-ল্লাহু, ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা-বিল্লাহ্”।

“আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম, অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎকাজ করার কারো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।” তখন তাকে সম্বোধন করে বলা হয় যে, আল্লাহ্ তোমার জন্য যথেষ্ট, তুমি সুরক্ষিত হয়েছ এবং তুমি সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছ, আর শয়তান তোমার থেকে বহু দূরে সরে গেছে।”[158]

৩. তিনি প্রত্যুষে ফজরের সালাতের জন্য মসজিদে গমনকালে বলতেন:

«اللَّهُمَّ اجْعَل فِي قلبِي نورًا، واجْعَل فِي لسَانِي نورًا، واجْعَل فِي سَمْعِي نورًا، واجْعَل فِي بَصَرِي نورًا، واجْعَل مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، واجْعَل مِنْ فَوْقِي نُورًا، واجْعَل مِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْظِمَ لِي نُورًا»

“আল্লা-হুম্মাজ-আল-ফী-ক্বালবী নূরান, ওয়া ফী- বাসারী নূরান, ওয়া ফী-সাম‘য়ী নূরান, ওয়া আন-য়ামীনী নূরান, ওয়া আন্-য়্যাসারী নূরান, ওয়া ফাওক্বী নূরান, ওয়া তাহ্তী নূরান, ওয়া আমা-মী নূরান, ওয়া খাল্ফী নূরান, আল্লা-হুম্মা আ‘য়যিম লী নূরান।”

---

[158] আবু দাউদ, তিরমিযী।

হে আল্লাহ ! তুমি আমার অন্তরে এবং জবানে ‘নূর’ জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আমার শ্রবণ শক্তিতে এবং আমার দর্শণ শক্তিতে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আমার উপরে, আমার নিচে, আমার ডানে, আমার বামে, আমার সামনে, আমার পিছনে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, হে আল্লাহ! তুমি জ্যোতিকে আমার জন্য অনেক বড় করে দাও।”[159]

৪. তিনি আরো বলেন: যখন কোনো ব্যক্তি স্বগৃহে প্রবেশ করে তখন সে বলবে:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا»

‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খাইরাল মাওলিজি ওয়া খাইরাল মাখরাজি, বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা, ওয়া বিসমিল্লাহি খারাজনা, ওয়া ‘আলাল্লাহি রাব্বিনা তাওয়াক্কাল-না।

“হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট উত্তম প্রত্যাগমন ও উত্তম বহির্গমন প্রার্থনা করছি, আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করি, আল্লাহর নামেই বের হই এবং আমাদের প্রভু আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করি।” অতঃপর নিজ পরিবারবর্গের উপর সালাম করবে।[160]

---

[159] বুখারী, মুসলিম।

[160] আবু দাউদ।

(গ) মসজিদে প্রবেশ ও মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় আল্লাহ্র যিক্‌র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[161]:

১. তিনি মসজিদে প্রবেশকালে বলতেন:

«أَعُوذُ باللهِ العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانِه القديم مِنَ الشيطانِ الرجيمِ»

‘আউযু বিল্লাহিল আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া বিসুলতানিহিল কাদীম, মিনাশ শায়তানির রাজীম

“আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর করুণাময় সত্বা ও সার্বভৌম শক্তির নামে।”[162]

২. তিনি বলেন: যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, নবীজীর উপর সালাত-সালাম পাঠ করে বলবে:

«اللَّهُمَّ افْتَح لي أبوابَ رحمتِكَ»

‘আল্লা-হুম্মাফতাহ্‌-লী আবওয়াবা রাহমাতিকা”

হে আল্লাহ ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলে দাও;-

আর যখন মসজিদ হতে বের হবে তখন বলবে:

---

[161] যাদুল মা‘আদ: ২/৩৩৬।

[162] আবু দাউদ।

«اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُك مِنْ فَضْلِكَ»

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন ফাদলিকা।

হে আল্লাহ ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি।"[163]

(ঘ) নতুন চাঁদ দেখাকালে আল্লাহর যিক্র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:[164]

মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদ দেখে বলতেন:

«اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمانِ، وَالسَّلَامَةِ والإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ»

'আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু 'আলাইনা বিল-আমনি ওয়াল ঈমান, ওয়াস-সালা-মাতি ওয়াল ইসলাম, রাব্বী ওয়া রাব্বুকা-ল্লাহ্।

হে আল্লাহ ! এই নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা ও ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে উদিত কর, আল্লাহ্ আমাদের এবং তোমার (চাঁদের) প্রভু-প্রতিপালক।"[165]

---

[163] আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

[164] যাদুল মা'আদ, ২/৩৬১।

[165] তিরমিযী।

(ঙ) হাঁচি ও হাই তোলাকালে আল্লাহর যিক্‌র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:[166]

১. সহীহ্ সনদে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেন: আল্লাহ্ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন, অতএব যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে

«الحمد لله»

'আল-হামদুলিল্লাহ্' বলে, তখন যে মুসলিমই তা শুনে তার উপর

«يَرْحَمُكَ اللَّهُ»

'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

আর হাই উঠার ব্যাপারটি হয়ে থাকে শয়তানের পক্ষ হতে, কাজেই তোমাদের কারো হাই উঠার উপক্রম হলে সে যেন তা সাধ্যমত চেপে রাখার চেষ্টা করে, কারণ কেউ হাই তুললে তাতে শয়তান হাসে।”[167]

---

[166] যাদুল মা'আদ, ২/৩৭১-৩৯৭।

[167] বুখারী।

২. তিনি যখন হাঁচি দিতেন তখন মুখের উপর নিজের হাত বা কাপড় রাখতেন এবং হাঁচির আওয়াজ নিচু বা নিম্নগামী করতেন।”[168]

৩. তিনি যখন হাঁচি দিতেন তখন কেউ

«يَرْحَمُكَ اللّٰهُ»

‘ইয়ারহামুকাল্লাহ্’ বললে তিনি জবাবে বলতেন:

«يَرْحَمُنا اللّٰهُ وإياكم، ويَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ»

“ইয়ারহামুনা-ল্লাহু ওয়া ইয়্যাকুম, ওয়া ইয়াগফিরু লানা ওয়া লাকুম”

৪. তিনি আরো বলেন : তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে বলবে:

«الحمدُ للّٰهِ»

‘আল-হামদুলিল্লাহ্’-সকল প্রশংসা আল্লাহুর জন্য, তখন তার ভাই অথবা সাথী বলবে:

«يَرْحَمُكَ اللّٰهُ»

‘ইয়ারহামুকাল্লাহ্’ আল্লাহ্ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুণ, তার জন্য সাথী- *‘ইয়ারহামুকাল্লাহ্’* বললে সে যেন জবাবে বলে:

---

[168] আবু দাউদ, তিরমিযী।

«يهديكم الله ويصلح بالكم»

আল্লাহ্ তোমাদের সৎপথে প্রদর্শণ করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভাল করুন।"[169]

৫. তিনি আরো বলেন: তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে

«الحمدُ للهِ»

'আল-হাম্দুলিল্লাহ্' বললে, তার জবাবে তোমরা

«يَرْحَمُكَ اللهُ»

"ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলবে, আর যদি সে হাঁচি দিলে

«الحمدُ للهِ»

'আল- হাম্দুলিল্লাহ্' না বলে, তাহলে তোমরাও

«يَرْحَمُكَ اللهُ»

'ইয়ারহামুকাল্লাহ্'- বলবে না।"[170]

---

[169] বুখারী।

[170] মুসলিম।

আর যদি কেউ তিনবারের অধিক হাঁচি দিতো, তাহলে তিনি চতুর্থ বারে *'ইয়ারহামুকাল্লাহ্'* বলতেন না, বরং বলতেন: এই ব্যক্তি সর্দি রোগে আক্রান্ত।[171]

৬. সহীহ্ সনদে প্রমাণিত যে, ইয়াহূদীগণ তাঁর উপস্থিতিতে হাঁচি দিতে চেষ্টা করতো এবং আশা করতো যে, তিনি জবাবে তাদেরকে

«يَرْحَمُكَ اللهُ»

'ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্' আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন- বলবেন, কিন্তু তিনি জবাবে বলতেন:

«يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بالَكُم»

"ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম"।

"আল্লাহ্ তোমাদের সৎপথ প্রদর্শণ করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভাল করুন।"[172]

(চ) কোনো বিপদগ্রস্ত লোক দেখে পঠিত দু'আ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[173]:

---

171 মুসলিম।

172 তিরমিযী।

173 যাদুল মা'আদ, ২/৪১৭

তিনি ইরশাদ করেন: যে কেউ কোনো বিপদগ্রস্ত লোক দেখে বলে:

«الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا»

'আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযি আ-ফা-নী মিম্মাব-তালাকা বিহী, ওয়া ফায্যালানী আরা কাসীরিন মিম্মান খালাকা তাফযীলা;-

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে নিরাপদে রেখেছেন সেই বিপদ থেকে যা দিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টি জগতের অনেকের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন", তাহলে সে উক্ত বিপদে আক্রান্ত হবে না, তা যে ধরণেরই হোক।"[174]

(ছ) মোরগের আওয়াজ ও গাধার ডাক শুনাকালে তাঁর আদর্শমালা[175]:

মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দেন, যখন তারা গাধার ডাক শুনে তখন যেন শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে, আর যখন মোরগের ডাক শুনে তখন যেন আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করে।"[176]

---

[174] আবু দাউদ, তিরমিযী।

[175] যাদুল মা'আদ, ২/৪২৬

[176] বুখারী, মুসলিম।

(জ) রাগান্বিত ব্যক্তির কথিত ও কৃত বিষয়াবলী প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:[177]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যাধিক রাগান্বিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন, সে যেন অযু করে এবং বসে পড়ে যদি সে দাঁড়ানো থাকে, আর শোয়ে পড়ে যদি সে বসা থাকে এবং বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে।"

[177] যাদুল মা'আদ, ২/৪২৩

(১৮) আযান ও আযানের সময় আল্লাহর যিক্‌র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[178]

১. রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারজী'য়ের সাথে আযান এবং তারজী'য় ছাড়া আযান উভয়টি সুন্নাত করেন।[179] আর ইকামতের শব্দগুলো দু'বার দু'বার ও একবার একবার করে উচ্চারণ করার বিধান করেন, কিন্তু 'ক্বাদ-ক্বামাতিস্ সালাহ্' বাক্যটি কখনই একবার বলেননি।

২. তিনি স্বীয় উম্মতের জন্য বিধান করেন যে, আযান শ্রবণকারী ঠিক সেই বাক্যগুলির পুনারাবৃত্তি করবে যেগুলি মুয়াযযিন বলে থাকে, কিন্তু 'হাইয়্যা আলাস্-সালাহ' ও হাইয়্যা আলাল-ফালাহ্' বাক্যদ্বয়ের পরিবর্তে 'লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা-বিল্লাহ্' বলা তাঁর থেকে সহীহ্ সনদে প্রমাণিত আছে।

৩. তিনি বলেন: যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে এ দু'আটি পাঠ করে:

«وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً»

---

[178] যাদুল মা'আদ, ২/৩৫৫।

[179] আযানে তারজী'য় শব্দের মর্মার্থ হলো: মুয়াযযিন কর্তৃক 'শাহাদত বাণীদ্বয়' উচ্চঃস্বরে বলার পর দ্বিতীয় বার নিম্নস্বরে পাঠ করা।'' অনুবাদক।

'আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া-আন্না মুহাম্মাদান রাসুলুল্লাহ্, রাযীদু বিল্লাহি রাববান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলান, ওয়া বিল-ইসলামে দ্বীনান;

"আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রাসূল, আর আল্লাহকে রব, মুহাম্মাদকে রাসূল এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট;" তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[180]

৪. তিনি আযান শ্রবণকারীর জন্যে বিধান প্রদান করেন যে, সে মুয়াযযিনের আযানের জবাবের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত-সালাম পাঠ করে এ দু'আটি পড়বে :

«اللّٰهُمَّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته».

'আল্ল-হুম্মা রাববা হাযিহিদ দাওয়াতিত তাম্মতি, ওয়াস সালাতিল ক্বায়েমাতি,আতি-মাহ্ মুদানিল ওয়াসিলাতা, ওয়াল-ফাযীলাতা, ওয়াবআসহু মাকামাম মাহ্ মুদানিল্লাযি ওয়াআদতাহ,

হে আল্লাহ্ ! এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রভু, তুমি মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উসীলা এবং

---

[180] মুসলিম।

ফযীলত তথা উচ্চতম মর্যাদা দান করো এবং তাঁকে তোমার ওয়াদাকৃত প্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দাও।”[181]

৫. তিনি আরো বলেছেন: আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু‘আ প্রত্যাখ্যাত হয় না।”[182]

---

[181] বুখারী।

[182] আবু দাউদ।

(১৯) যিল-হাজ্জ মাসে আল্লাহর যিক্‌র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[183]

১. রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিল-হাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে বেশী বেশী দু‘আ করতেন এবং তাতে অধিকহারে তাসবীহ, ‘তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ তথা ‘সুবহানাল্লাহ্‌, আল-হামদুলিল্লাহ্‌, লা-ইলাহা ইল্লল্লাহ, আল্লাহু আকবর’ পাঠ করার নির্দেশ দেন।”

---

[183] যাদুল মা‘আদ, ২/৩৬০।

(২০) কুরআনে মাজীদ তিলাওয়াত প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[184]

১. কুরআনের অংশবিশেষ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল, যা তিনি নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন এবং তাতে তিনি কখনই অলসতা করতেন না।

২. তাঁর তিলাওয়াত ছিল ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, তীব্রতা ও তাড়াহুড়ার সাথে নয়, বরং প্রতিটি অক্ষর সুস্পষ্ট করে উচ্চারণ করতেন।

৩. তাঁর তিলাওয়াত ছিল বিভক্ত ও সাইজ করা। তিনি প্রত্যেকটি আয়াত শেষে থেমে যেতেন। তিনি ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে সূরা আবৃত্তি করতেন, এমনকি বড় সূরা আরো অত্যাধিক বড় হয়ে যেতো।

৪. তিনি মদ্দের হরফকে টেনে দীর্ঘায়িত করে পড়তেন, অতএব ‘আর- রাহমা-ন’ ও ‘আর রাহী-ম’ শব্দদ্বয় টেনে দীর্ঘায়িত করে পাঠ করতেন।

৫. তিনি তিলাওয়াতের শুরুতে আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন:

«أَعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

‘আ‘উযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম;-

---

[184] যাদুল মা‘আদ, ২/ ৩৬৩।

“আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

আবার কখনো বলতেন:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ»

‘আল্লা-হুম্মা আউযু বিকা মিনাশ্ শায়ত্বানীর রাজীম, মিন হামযিহী, ওয়া নাফখিহী, ওয়া নাফসিহী।”[185]

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান এবং তার কুমন্ত্রনা, ফুৎকার ও ওয়াসওয়াসা হতে।

৬. তিনি দাঁড়ানো, বসা, শোয়া এবং অযু অবস্থায় ও অযু ছাড়া সর্বাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতেন, একমাত্র গোসল ফরয হওয়া ছাড়া অন্য কিছু তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত হতে বিরত রাখতো না।

৭. তিনি সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং বলেন: “যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”[186]

---

[185] আবু দাউদ, ইবন মাজাহ।

[186] বুখারী।

তিনি আরো বলেন: “সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করে কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করো।”[187]

৮. তিনি কখনো অন্যের মুখ থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে ভালবাসতেন।”[188]

৯. তিনি সিজদার আয়াত পাঠের পর ‘আল্লাহু আকবর’- বলে সিজদা করতেন এবং কখনো সিজদায় বলতেন:

«سَجَدَ وَجْهِي للذي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سمعَه وبصرَه بحولِه وقوتِه»

‘সাজাদা ওয়াজহী লিল্লাজী খালাকাহু, ওয়া-শাক্কা সাম‘আহু ওয়া বাছারাহূ, বি-হাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী;

“আমার মুখমণ্ডল (সহ আমার সমগ্র দেহ) সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার কর্ণ ও তার চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তিতে।”[189]

আবার কখনো বলতেন:

«اللّٰهُمَّ اكتب لي بها عندك أجراً وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذُخراً وتقبلها منّي كما تقبلتها من عبدك داود»

---

[187] আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবন মাজাহ।

[188] বুখারী।

[189] আবু দাউদ, তিরমিযী।

'আল্লাহুম্মা উকতুব লী বিহা ইনদাকা আজরান, ওয়াদ্বা' 'আন্নী বিহা ওয়িযরান, ওয়াজ'আলহা লী ইনদাকা যুখরান ওয়া তাকাব্বালহা মিন্নী কামা তাকাব্বালতাহা মিন আবদিকা দাঊদ'

"হে আল্লাহ, এর দ্বারা তোমার নিকট আমার জন্য নেকী লিখে রাখো এবং এর দ্বারা আমার পাপরাশি দূর করে দাও এবং একে আমার জন্য গচ্ছিত সম্পদ হিসেবে জমা করে রাখো, আর একে আমার নিকট হতে কবুল করো যেমন কবুল করেছো তোমার বান্দা দাউদ্ (আলাইহিস সালাম) হতে।"[190]

আর সিজদায়ে তিলাওয়াত হতে মাথা উত্তোলনকালে তাকবীর বলা তাঁর থেকে প্রমাণিত নেই, আর না তিনি তাশাহুদ পাঠ করেন, আর না সালাম ফিরান।"

---

[190] তিরমিযী, ইবন মাজাহ।

(২১) খোৎবা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[191]

১. রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোৎবা দেওয়ার সময় তাঁর চোখ দু'টি লাল হয়ে যেতো, স্বর উচ্চ হতো এবং তাঁর রাগভাব খুব বেড়ে যেতো, মনে হয় যেন তিনি কোনো সৈন্য বাহিনীকে সকাল-সন্ধ্যায় হামলার ভয় প্রদর্শনকারী, তিনি বলতেন: আমি ও কিয়ামত দিবস প্রেরিত হয়েছি এরূপ, তখন তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যম আঙ্গুলী একত্রিত করতেন, তিনি আরো বলতেন:

«أما بعدُ... فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدْي هَدْيُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشَرَّ الأُمُورِ محدثاتها، وكلّ بدعة ضلالة»

“অতঃপর, নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম জীবনাদর্শ 'মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শ, আর নিকৃষ্টতম বিষয় হলো দ্বীনে নবাবিষ্কৃত বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।”[192]

২. তিনি যখনই খোৎবা প্রদান করতেন তখনই আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে আরম্ভ করতেন, তিনি সাহাবীদেরকে 'খোৎবাতুল হাজাহ্- (প্রয়োজনের খোৎবা) তথা এই খোৎবাটি শিক্ষা দিতেন:

---

[191] যাদুল মা'আদ, ১/১৭৯।

[192] মুসলিম।

«الحمدُ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئاتِ أعمالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فلا هَادِيَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য কামনা করি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং সকল বিপর্যয় ও কুকীর্তি হতে আত্মরক্ষার জন্য আমরা তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি, আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তার কোনো পথভ্রষ্টকারী নেই, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো পথ প্রদর্শণকারী নেই। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যিকার কোনো মা'বুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

অতঃপর তিনি এ তিনটি আয়াত পাঠ করতেন:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢ ﴾ [ال عمران: ١٠٢]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভাবে ভয় করো এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মরো না।” সূরা আলে ইমরান, আ: ১০২,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ ﴾ [النساء: ١]

“হে মানবমণ্ডলী ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন।” সূরা নিসা, আ: ১,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ ﴾ [الاحزاب: ٧٠]

“হে মু’মিনগণ ! তোমরা আল্লাকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।” সূরা আহযাব, আ: ৭০-৭১,

৩. তিনি সাহাবীদেরকে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে ইস্তিখারা করার নিয়ম শিক্ষা দিতেন যেমনভাবে তিনি তাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন: যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন ফরয সালাত ছাড়া দু’রাকাত নফল পড়ে, তারপর এ দু‘আটি পড়ে:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أستخيرُكَ بعلمكَ وأستقدرُكَ بقدرتِك وأسألُكَ مِنْ فضلِكَ العظيمِ، فإنَّكَ تقدرُ ولا أقدرُ، وتعلمُ ولا أعلمُ، وأنْتَ عَلَّامُ الغيوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تعلمُ أَنَّ هذا الأمرَ – وَيُسَمِّي حَاجَتَهَ – خَيْرٌ لي في ديني ومعاشِي وعاقبةِ أَمْرِي – أو قال: عاجِلِه وآجِلِه – فاقْدُرْهُ لي وَيَسِّرْهُ لي، ثم بَارِكْ لي فيه، وإِنْ كُنْتَ تعلمُ أَنَّ هذا الأمرَ شَرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبةِ أمري – أو قال: عاجِله وآجله – فاصرفْهُ عني واصرفْنِي عَنْهُ واقْدُرْ لي الخيرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ»

‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বি’ইলমিকা, ওয়া আস্তাক্বদিরুকা বিকুদরাতিকা, ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিকাল আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বাদিরু ওয়ালা-আক্বদিরু, ওয়া-তা‘লামু ওয়ালা-আ‘লামু, ওয়া-আন্তা আল্লামুল গুয়ূব, আল্লা-হুম্মা ইন-কুন্তা তা‘লামু আন্না হা-যাল আমরা,

{‘হা-যাল আম্রা’ বলার সময় নিজের প্রয়োজনের কথা মনে করবে} খায়রুন-লী ফী-দ্বীনী ওয়া-আ-ক্বিবাতি আমরী /ফী-আ-জিলি আমরী ওয়া-আজিলিহী, ফাক্বদিরহু-লী, ওয়া-ইয়াসসিরহু-লী, সুম্মা বা-রিকলী-ফীহি, ওয়া ইন-কুন্তা তা‘লাম আন্না-হা-যাল আম্রা, {এখানেও পুনরায় নিজের প্রয়োজনের কথা মনে করবে} শাররুল -লী ফী-দ্বীনী ওয়া-মা‘আশী ওয়া-আ-ক্বিবাতি আমরী /ফী-আ-জিলি আমরী ওয়া-আজিলিহী, ফাসরিফহু ‘আন্নী, ওয়াসরিফনী ‘আনহু’ ওয়াকদুর লিয়াল খাইরা হাইসু কানা, ছুম্মা রাদ্বিনী বিহী”[193]

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমারই জ্ঞানের সাহায্যে এ বিষয়ে ইস্তিখারা (কল্যাণ প্রার্থনা) করছি এবং তোমার শক্তির বদৌলতে তোমার নিকট এ বিষয়ে কল্যাণ লাভের সামর্থ প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট এ বিষয়ে কল্যাণ লাভের সামর্থ প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তোমারই মহান অনুগ্রহ ও কল্যাণের ভাণ্ডার থেকে প্রার্থনা করছি, কারণ তুমি তো সব কিছু করার ক্ষমতা রাখো আর আমার তো ক্ষমতা নেই এবং তুমি তো সবই জান, আর আমি জানি না, আর তুমিই তো গায়েবের একমাত্র মহাজ্ঞানী, -হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, আমার মনস্থ করা এই বিষয়টি আমার জন্য কল্যাণকর হবে আমার দ্বীনি ও দুনয়াবী জীবনে এবং শেষ পরিণামে, কিংবা আমার জলদি কাজে অথবা বিলম্বিত কাজে, তাহলে সে কাজাটি আমার জন্য নির্ধারণ করে দাও এবং তা আমার জন্য

---

[193] বুখারী।

সহজ করে দাও, আর তাতে আমার জন্য বরকত দান করো, পক্ষান্তরে তুমি যদি জান যে, আমার মনস্থ করা এই বিষয়টি আমার জন্য ক্ষতিকর হবে আমার জলদি কাজে অথবা বিলম্বিত কাজে, তাহলে তাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখো, আর আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করো তা যেখানেই রয়েছে এবং তার উপর আমাকে সন্তুষ্ট রাখো।”

(২২) ঘুমানো, জাগ্রত হওয়া ও স্বপ্ন প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[194]

১. রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বিছানার উপর ঘুমাতেন, আর কখনো চর্মনির্মিত বিছানার উপর, কখনো চাটাইয়ের উপর। আবার কখনো যমীনের উপর, আর কখনো চৌকির উপর, তাঁর বিছানা ছিল চামড়ার, যার ভিতরকার উপকরণ ছিল খেজুর বৃক্ষের ছাল, আর অনুরূপ ছিল তাঁর বালিশ।

২. তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘুমাতেন না এবং প্রয়োজনীয় ঘুম থেকে নিজেকে বঞ্চিতও করতেন না।

৩. তিনি রাতের প্রথমাংশে ঘুমাতেন এবং শেষাংশে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করতেন, আবার কখনো মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার্থে রাতের প্রথমাংশেও জাগ্রত থাকতেন।

৪. তিনি সফরকালে যখন শেষরাতে বিশ্রাম করতেন তখন তিনি তাঁর ডান কাতে শুতেন, আর যখন তিনি ফজরের কিচুক্ষণ আগে বিশ্রাম করতেন তখন বাহু খাড়া করে হাতের পাঞ্জার উপর মাথা রাখতেন।

৫. তিনি ঘুমালে সাহাবীদের কেউ তাঁকে জাগ্রত করতো না যতক্ষণ না তিনি নিজেই জাগ্রত হতেন, বস্তুত: তাঁর চক্ষুদ্বয় ঘুমালেও তার অন্তর ঘুমাতো না।

---

[194] যাদুল মা'আদ, ১/১৪৯।

৬. তিনি যখন ঘুমানোর উদ্দেশ্যে তাঁর শয্যায় গমন করতেন, তখন বলতেন:

«باسمكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وأموتُ»

'বিইসমিকা আল্লা-হুম্মা আহইয়া ওয়া আমূতু; -

হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমার মৃত্যুবরণ ও আমার জীবনধারণ।"[195] এবং তিনি স্বীয় দু'হাতের তালু মিলাতেন, অতঃপর সূরা ইখলাস 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' এবং 'মু'আউয়াযাতাইন' তথা 'কুল আউযু বি রাব্বিল ফালাক্ব' ও 'ক্বুল আউযু বি রাব্বিন নাস' পাঠ করে তাতে ফুঁক দিতেন, তারপর দু'হাতের তালু দ্বারা দেহের যতটা অংশ সম্ভব মাসেহ করতেন। মাসেহ আরম্ভ করতেন তাঁর মস্তক ও মুখমণ্ডল এবং দেহের সামনের দিক থেকে, আর তিনি এরূপ তিনবার করতেন।"[196]

৭. তিনি ডান কাতে ঘুমাতেন এবং গালের নিচে হাত রেখে বলতেন:

«اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ»

'আল্লা-হুম্মা ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাব'আসু ইবা-দাকা;

---

[195] বুখারী।

[196] বুখারী।

“হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার আযাব হতে রক্ষা করো যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুত্থান ঘটাবে।”[197]

তিনি তাঁর কোনো সাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেন: যখন তুমি শয্যায় গমন করবে তখন সালাতের অযুর ন্যায় অযু করবে, অতঃপর তোমার ডান কাতে শুয়ে বলবে:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أسلمتُ نَفْسِي إليكَ، ووجَّهتُ وَجْهِي إليكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إليكَ، وألجأتُ ظهري إليكَ، رغبةً ورهبةً إليكَ، لا ملجأ ولا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إليكَ، آمنتُ بِكِتَابِكَ الذي أنزلتَ، وبنبيكَ الذي أرسلتَ»

“আল্লাহুম্মা ইন্নি আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়াওয়াজ্জাহতু ওয়াজহী ইলাইকা, ওয়াআলজা’তু যাহরী ইলাইকা, রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লা মালজাআ ওয়ালা মানজাআ মিনকা ইল্লা ইলাইকা, আ-মানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আনযালতা, ওয়াবিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা”।

“হে আল্লাহ্! আমি আমার নফসকে তোমার কাছে সমর্পন করলাম, আমার চেহারাকে তোমার প্রতি নিবিষ্ট করলাম। আমার সমগ্র কার্যক্রম তোমার প্রতি ন্যস্ত করলাম, আমার পৃষ্ঠদেশকে তোমার আশ্রয় ঠেকালাম, তোমার নিকট আমার রহমতের আশা-ভরসা এবং তোমার শাস্তির ভয়-ভীতি সহকারে, তুমি ছাড়া কোথাও আশ্রয়স্থল ও

---

[197] আবু দাউদ।

মুক্তির উপায় নেই, আমি ঈমান আনলাম তোমার কিতাবের উপর, যা তুমি নাযিল করেছো এবং তোমার নবীর উপর, যাকে তুমি প্রেরণ করেছো"। এ কথা বলার পর যদি তুমি সেই রাতে মারা যাও, তাহলে তুমি ইসলামের উপরই মারা যাবে"[198]

৮. তিনি রাত্রে জাগ্রত হয়ে বলতেন:

«اللَّهُمَّ رَبَّ جبريلَ، وميكائيلَ، وإسرافيلَ فَاطِرَ السَّماواتِ والأَرْضِ، عالمَ الغيبِ والشهادةِ، أنتَ تحكمُ بَيْنَ عبادِك فِيْمَا كانوا فيهِ يختلفونَ، اهْدِني لما اخْتُلِفَ فيه من الحقِّ بإذنِكَ، إنك تهدي مَنْ تشاءُ إلى صراطٍ مستقيم»

"আল্লাহুম্মা রাব্বা জীবরীল ওয়া মীকাঈলা ওয়া ইসরাফীলা, ফাত্বীরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি, 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি, আন্‌তা তাহ্‌কুমু বাইনা ইবাদিকা ফীমা কানূ ফীহি ইয়াখতালিফূন; ইহদিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কী বি ইযনিকা ইন্নাকা তাহদী মান তাশা'উ ইলা সীরাতিম্মুস্তাক্বীম"

"হে আল্লাহ্! জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল -এর রব, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, গায়েব ও উপস্থিতের মহাজ্ঞানী, তুমিই তোমার বান্দাদের মাঝে ফায়সালা দিয়ে থাক যে সব বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে, অতএব বিরোধপূর্ণ বিষয়াবলীতে তুমি

[198] বুখারী।

আমাকে স্বীয় অনুগ্রহে সত্যের প্রতি পথ প্রদর্শণ করো, কেননা তুমি যাকে চাও সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকো।”[199]

৯. তিনি বিছানায় জাগ্রত হয়ে বলতেন:

«الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُور»

‘আল্ হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা’দামামাতানা, ওয়া ইলাইহিন নুশুর।”

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যু দান করার পর পুনরায় জীবন দান করেছেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।

আর তখন তিনি মিসওয়াক করতেন এবং অনেক সময় সূরা আলে ইমরানের শেষ দশটি আয়াত পাঠ করতেন।”[200]

১০. তিনি ভোরে মোরগের ডাক শুনে জাগ্রত হতেন, তখন তিনি আল হামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, বলতেন এবং আল্লাহর দরবারে দু‘আ করতেন।

১১. তিনি বলেন: “সৎ-ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব কোনো ব্যক্তি অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে সে যেন তার বাঁ দিকে তিনবার থু-তু নিক্ষেপ করে এবং

---

[199] মুসলিম।

[200] বুখারী, মুসলিম।

শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর সে এ স্বপ্ন কারো নিকট বর্ণনা করবে না। পক্ষান্তরে যদি সে ভালো স্বপ্ন দেখে থাকে, তাহলে তার উচিত সুসংবাদ গ্রহণ করা এবং তা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া কারো নিকট তা বিবৃত না করা।”[201]

তিনি আরো বলেন: তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে সে যে কাতে শুয়েছিল তা যেন পরিবর্তন করে নেয় এবং উঠে সালাত পড়ে।”[202]

---

[201] বুখারী, মুসলিম।

[202] মুসলিম।

(২৩) ফিৎরাত বা স্বভাবজাত-কর্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ ও সৌন্দর্যের উপকরণ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:[203]

১. রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যধিক খোশবু ব্যবহার করতেন এবং খোশবু-সুবাস পছন্দ করতেন এবং তিনি কখনো খোশবু ফিরিয়ে দিতেন না।"[204] তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় ছিল মেশক আম্বরের সুগন্ধি।

২. তিনি মিসওয়াক করা পছন্দ করতেন, তিনি রোযারত অবস্থায় এবং রোযা ছাড়া অবস্থায় মিসওয়াক করতেন, অনুরূপ নিদ্রা হতে জাগ্রতকালে, অযু করার সময়, সালাতের সময় এবং ঘরে প্রবেশ কালে মিসওয়াক করতেন।

৩. তিনি সুরমা লাগাতেন এবং বলতেন: তোমাদের সর্বোত্তম সুরমা হলো 'ইস্মদ' তথা কালো সুরমা, যা চক্ষু পরিস্কার করে এবং চুল উৎপন্ন করে।"[205]

৪. তিনি কখনো নিজেই মাথায় ও দাড়িতে চিরুনী করতেন, আবার কখনো উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা তাঁর মাথা ও দাড়িতে চিরুণী করে দিতেন আর মাথা মুন্ডন করা। আর মাথা

---

[203] যাদুল মা'আদ, ২/১৬৭।

[204] বুখারী।

[205] আবু দাউদ, ইবন মাজাহ।

মুণ্ডনের ব্যাপারে তার নিয়ম ছিল সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডন করা অথবা সম্পূর্ণ চুল রেখে দেওয়া।

৫. হজ্জ-ওমরা ছাড়া অন্য সময় মাথা মুণ্ডন তাঁর থেকে সহীহ্ সনদে প্রমাণিত নেই, আর তাঁর চুল ছিল কাঁধের উপর প্রচুর, জুম্মার উপরে এবং ওফরার চেয়ে কম, যা তাঁর কানদ্বয়ের লতির সাথে লেগেছিল।

৬. তিনি 'ক্বযা'অ'- তথা মাথার চুলের কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রেখে দিতে নিষেধ করেন।

৭. তিনি আরো বলেন: তোমরা কাফের-মুশরিকদের বিরোধিতা করো, দাড়ি লম্বা করো এবং গোঁফ কেটে ফেলো।"[206]

৮. পোষাক-পরিচ্ছেদ হতে যা কিছু সহজ সাধ্য হতো, তাই তিনি পরিধান করতেন, কখনো পশমের তৈরী, আবার কখনো তুলা-সুতার তৈরী, আর কখনো উলের তৈরী পোষাক। আর তাঁর নিকট সব চেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় পোষাক ছিল 'ক্বামীস'-তথা বড় জামা।"[207]

৯. তিনি ডোরাকাটা ইয়ামানী চাদর ও ডোরাকাটা সবুজ চাদর পরিধান করেছেন, তিনি জুব্বা, ক্বাবা (এমন কাপড় যার হাতা ও মধ্যভাগ ছোট, পিছনে ফাড়া) জামা, পায়জামা, লুঙ্গি, চাদর, চর্মের মোজা, জুতা ও পাগড়ি পরিধান করেছেন।

---

[206] বুখারী, মুসলিম।

[207] আবু দাউদ, তিরমিযী।

১০. তিনি কখনো পাগড়ির একাংশ মুখের তালুর নিচ দিয়ে দিতেন, পাগড়ির কিনারা কখনো পিছনে ঝুলে রাখতেন, আর কখনো ঝুলে রাখতেন না।

১১. তিনি কখনো কখনো কালো রং এর কাপড় পরিধান করেন, আবার কখনও কখনও লাল-ডোরকাটা 'হুল্লা' তথা লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করেছিলেন।"[208]

১২. তিনি রূপার আংটি পরেছেন, আর তার নকশার দিক হাতের কব্জির দিকে রাখতেন।

১৩. তিনি যখন কোনো নতুন কাপড় পরতেন, তখন প্রথমে তার নাম উল্লেখ করতেন, তারপর এ দু'আটি পাঠ করতেন:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ كَسَوْتَنِي هَذَا القَمِيْصَ أَو الرِّدَاءَ أو العمامَةَ، أَسألُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ ما صُنِعَ لَهُ»

'আল্লা-হুম্মা আনতা কাসাওতানী হাযা (আল কামীস আও আররিদা' আও আল-'ইমামাহ), আস্আলুকা খায়রাহু ওয়া-খায়রা মা-সুনিআ লাহু, ওয়া-'আউযুবিকা মিন শাররিহী, ওয়া-শাররি মা-সুনি'আ লাহু।

হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, তুমিই এ কাপড় (অথবা চাদর অথবা পাগড়ী) আমাকে পরিয়েছো, আমি তোমার নিকট এর

[208] বুখারী।

মধ্যে নিহিত কল্যাণ এবং এটি যে জন্য তৈরী করা হয়েছে সেসব কল্যাণ প্রার্থনা করি, আর আমি এর অনিষ্ট এবং এটি তৈরীর অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি।”[209]

১৪. তিনি যখন তাঁর জামা পরতেন তখন ডান দিক থেকে শুরু করতেন।

১৫. তিনি অযু করা, জুতা পরিধান করা, মাথা আঁচড়ানো এবং আদান-প্রদান ডান দিক থেকে করতে ভালোবাসতেন।

১৬. তিনি যখন হাঁচি দিতেন তখন মুখের উপর নিজের হাত বা কাপড় রাখতেন এবং হাঁচির আওয়াজ নিচু করতেন।

১৭. তিনি পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন।”[210]

১৮. তিনি হাঁসির বিষয় হলে হাঁসতেন এবং কাঁদার বিষয় হলে কাঁদতেন, তবে তাঁর অধিকাংশ হাঁসা ছিল মুচকি হাসি, আর সর্বাধিক হাসির সময় তাঁর দু'পার্শ্বের দাঁত দেখা যেতো, তিনি কখনই মুখগহ্বর বা কণ্ঠতালু পর্যন্ত প্রকাশ করে ক্বাহ্-ক্বাহ্ করে হাসেন নি, পক্ষান্তরে তাঁর কান্নাও অনুরূপ ছিল, তিনি কখনই অশ্রুসিক্ত হতো এবং তাঁর বক্ষে ফুটন্ত হাঁড়ির ন্যায় আওয়াজ শোনা যেতো।”

---

[209] তিরমিযী, আবু দাউদ।

[210] বুখারী, মুসলিম।

(২৪) সালামের আদান-প্রদান ও অনুমতি প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[211]

১. রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাওমের কাছে গমন করলে তাদের সালাম করতেন, তাদের নিকট হতে প্রত্যাবর্তন কালেও সালাম করতেন এবং সালামের ব্যপক প্রচলন করার নির্দেশ দেন।

২. তিনি বলেন: "ছোট সালাম করবে বড়কে, চলাচলকারী সালাম করবে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে, আরোহী ব্যক্তি সালাম করবে পদচারীকে এবং কম সংখ্যক লেকেরা সালাম করবে বেশী সংক্যক লোককে।"[212]

৩. তিনি কারো সাথে সাক্ষাৎকালে প্রথমেই সালাম করতেন, আর কেউ তাঁকে সালাম করলে, তিনি সাথে সাথে অনুরূপ কিংবা তার চেয়ে উত্তমরূপে উত্তর দিতেন, কিন্তু সালাত অথবা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করা ইত্যাদি বিশেষ কারণে সালামের উত্তর বিলম্বিত করতেন।

৪. তিনি প্রথমে

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ»

---

[211] যাদুল মা'আদ, ২/৩৭১।

[212] বুখারী, মুসলিম।

‘আসসালামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্, বলে সালাম করতেন। অর্থাৎ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমতও। প্রথমে সালাম প্রদানকারীর পক্ষ থেকে

«عليكَ السَّلامُ»

‘আলাইকাস্ সালাম’ বলা তিনি অপছন্দ করতেন (কারণ এটা মৃতদের সালাম) এবং তিনি সালাম প্রদানকারীর সালামের জবাবে বলতেন:

«وَعَلَيكَ السلام»

‘ওয়া ‘আলাইকাস সালাম’, আরবী শব্দ ‘ওয়াও’-এর যোগ করে বলতেন।

৫. তাঁর আদর্শ ছিল, যদি জনসাধারণের সমাবেশ খুব বড় ও বিরাট হতো যেখানে এক সালাম সবার নিকট পৌঁছে না, তখন তিনি তিনবার সালাম দিতেন।

৬. তাঁর আদর্শ ছিল, মসজিদে প্রবেশকারী প্রথমে দু’রাকাত ‘তাহিয়্যাতুল মসজিদ’ আদায় করবে, অতঃপর মসজিদের সমাবেশে এসে তাদের সালাম করবে।

৭. তিনি হাতের ইশারায় অথবা মাথা নাড়িয়ে অথবা আঙ্গুলের ইশারায় সালামের উত্তর দিতেন না, তবে শুধু সালাতরত অবস্থায় তিনি ইশারায় সালামের উত্তর দেন।

৮. তিনি শিশু কিশোরদের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় তাদের সালাম করেন, অনুরূপ মহিলাদের সমাবেশ দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় তাদের সালাম করেন। আর সাহাবীগণ জুম'আর সালাত পড়ে ফেরার পথে এক বৃদ্ধা মহিলাকে সালাম করতেন[213]।

৯. তিনি অনুপস্থিতের জন্য সালাম বহনও করাতেন এবং নিজেও করতেন।[214] আর তাঁকে কেউ অন্যের প্রেরিত সালাম পৌঁছালে, তিনি সালাম প্রেরণকারী ও বহণকারী উভয়কে সালামের উত্তর দিতেন।[215]

১০. তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: এক ব্যক্তি যখন তার ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে, সে কি তার প্রতি মাথা ঝুকাবে? তিনি উত্তরে বলেন: না, আবার জিজ্ঞেস করা হলো: সে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে

---

[213] যিনি বীটের শিকড় ও যবের দানা পিষে তাদের জন্যে খাবার তৈরী করতেন।" অনুবাদক।

[214] তিনি উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-কে জিবরীল আমীন আলাইহিস সালাম-এর সালাম পৌছান। অনুবাদক।

[215] অর্থাৎ বলতেন : ওয়া আলাইকা ওয়া আলাইহিস্ সালাম।" অনুবাদক।

এবং চুমো খাবে ? উত্তরে তিনি বলেন: না, আবার জিজ্ঞেস করা হলো: সে কি তার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মুসাফাহা করবে? উত্তরে তিনি বলেন: হ্যাঁ,।”[216]

১১. তিনি পরিবার -পরিজনের নিকট অপ্রত্যাশিতভাবে-হঠাৎ এসে উপনীত হতেন না; যাতে তারা ভয় পায়, বরং তিনি তাদের সালাম করতেন এবং তাদেরকে বিবিধ (কুশলাদির) প্রশ্ন করতেন অথবা তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে প্রবেশ করতেন।

১২. তিনি রাত্রিবেলায় পরিবার-পরিজনের নিকট গমন করলে এমনভাবে সালাম করতেন যা নিদ্রিত লোকদের জাগাতো না, তবে জাগ্রত লোকেরা তাঁর সালাম শুনে নিতো।”[217]

১৩. তাঁর আদর্শ ছিল যে, যখন অনুমতিপ্রার্থীকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কে? তখন সে জবাবে বলবে: আমি অমুকের পুত্র অমুক, অথবা সে নিজের উপনাম বা ডাকনাম ইত্যাদি বলবে, আর সে যেন ‘আমি’ বা এ ধরণের অস্পষ্ট কিছু না বলে।

১৪. তিনি তিনবার করে অনুমতি চাইতেন, অনুমতি দেওয়া না হলে তিনি ফিরে যেতেন।

---

[216] তিরমিযী।

[217] মুসলিম।

১৫. তিনি সাহাবীদেরকে অনুমতি চাওয়ার পূর্বে সালাম করা শিক্ষা দিতেন।

১৬. তিনি কারো বাড়ীতে গেলে তাদের দরজার সামনে দাঁড়াতেন না, বরং ডান কিংবা বাম দিকে সরে দাঁড়াতেন।

১৭. তিনি বলেন: "দৃষ্টি পড়ার কারণেই তো অনুমতি নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"[218]

---

[218] বুখারী, মুসলিম।

(২৫) কথা-বার্তা ও নীরবতা, বক্তব্য-ভাষণ ও সুন্দর নামকরণ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[219]

১. রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক শুদ্ধভাষায় বাক্যালাপে পারদর্শী এবং তাদের মাঝে সর্বাপেক্ষা মাধুর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদানকারী ছিলেন।

২. তিনি দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকতেন, বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না, আর যেই বিষয়টি তাঁর সাথে সম্পৃক্ত নয় সেই ব্যাপার তিনি কোনো কথা বলতেন না, তিনি যে বিষয়ে সাওয়াবের আশা করতেন শুধু সেই বিষয়েই কথা বলতেন।

৩. তিনি 'জাওয়ামেউল কালিম'-তথা ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য' দ্বারা সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেন, যা গণনাকারী গণনা করতে সক্ষম হতো, তা অতিদ্রুত ও তাড়াহুড়া করে বলা হতো না, যা সংরক্ষণ করা যায় না, আর না তা কর্তিত ও বিচ্ছিন্ন ছিল; যার মাঝে দীর্ঘ নীরবতা হতো।

৪. তিনি স্বীয় ভাষণে সর্বাপেক্ষা সুন্দর শব্দ চয়ন করতেন এবং স্বীয় উম্মতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি মনোনীত করতেন, তিনি কখনো গালমন্দকারী ও অশালীন বাক্য উচ্চারণকারী ছিলেন না।

---

[219] যাদুল মা'আদ, ১/১৭৫, ২/৩২০।

৫. তিনি উচ্চামর্যাদাসম্পন্ন শব্দ অনোপযুক্ত লোকদের শানে ব্যবহার করা, কিংবা অপছন্দনীয় শব্দ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের শানে ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন, সুতরাং তিনি কোনো মুনাফিক ব্যক্তিকে 'সাইয়্যেদ'- বা নেতা বলে সম্বোধন করতে নিষেধ করেন এবং আবু জাহালকে আবুল হাকাম বলতে বারণ করেন, অনুরূপ কোনো রাজা-বাদশাকে রাজাধিরাজ অথবা পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা ইত্যাদি বলতে নিষেধ করেন।

৬. তিনি সেই ব্যক্তিকে দিকনির্দেশনা দেন যাকে শয়তান কোনো হোঁচট খাইয়েছে (বা কুমন্ত্রণা দিয়েছে) সে যেন আল্লাহর নাম ধারণ করে বলে, 'বিসমিল্লাহ'। তাকে (শয়তানকে) যেন লা'নত বা গালি-গালাজ না করে। অনুরূপ 'শয়তান ধ্বংস হোক' ইত্যাদি না বলে[220]।

৭. তিনি সুন্দর নাম পছন্দ করতেন এবং তিনি নির্দেশ দেন যে, কেউ তাঁর নিকট দূত প্রেরণ কালে যেন সুন্দর নাম ও সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট লোককে দূত হিসেবে প্রেরণ করে। আর তিনি নামের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করতেন, তিনি ব্যক্তির সাথে তার নামের সংযুক্তি করতেন।

---

[220] কারণ এর মাধ্যমে শয়তানের মনে অহঙ্কার এসে যায় এবং সে মনে করে যে বনী আদম তার প্ররোচনাকে বড় কর দেখছে। আর যদি আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তখন সে হীন হয়ে যায়। সম্পাদক

৮. তিনি বলেন: আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নাম হলো 'আব্দুল্লাহ' আল্লাহর বান্দা, ও আব্দুর রহমান' -করুণাময় আল্লাহর বান্দা। আর সর্বাধিক সত্য নাম হলো 'হারেস'- যমীন আবাদকারী ও 'হাম্মাম'-অত্যাধিক চিন্তা-ভাবনাকারী। পক্ষান্তরে সর্বাপেক্ষা মন্দ নাম হলো 'হারব'- লড়াই-যুদ্ধ এবং 'মুররাহ'- তিক্ত স্বাদযুক্ত।"[221]

৯. তিনি 'আস্বিয়াহ'-পাপী মহিলা'- নাম পরিবর্তন করে তাকে বলেন: তুমি 'জামীলাহ্' সুন্দরী ও সচ্চরিত্রবর্তী মহিলা। অনুরূপ তিনি 'আস্রম' অভাবী- নাম পরিবর্তন করে 'যুরাআহ্'-ফসল ও বীয বপণকারী নামকরণ করেন। তিনি মদীনায় আগমন করে তার পুরাতন নাম 'ইয়াসরিব' পরিবর্তন করে তাইয়্যেবাহ্' পবিত্র, উত্তম ভুমি নামকরণ করেন।

১০. তিনি নিজের সাথীদের ডাকনাম বা উপনাম রাখতেন, অনেক সময় শিশু-কিশোরদেরও ডাকনাম রাখেন এবং স্বীয় স্ত্রীদের কারো কারো ডাকনাম রাখেন।

১১. তাঁর আদর্শ ছিল যার ছেলেসন্তান আছে, আর যার ছেলে-সন্তান নেই উভয়ের ডাকনাম রাখা এবং তিনি বলেন: তোমরা আমার নামে নাম রেখো, কিন্তু আমার ডাকনামে ডাকনাম রেখো না।"[222]

---

[221] মুসলিম।

[222] বুখারী, মুসলিম। অর্থাৎ, একই ব্যক্তির নাম মুহাম্মদ এবং ডাকনাম আবুল ক্বাসিম রাখা যাবে না।" অনুবাদক।

১২. তিনি রাতের আহারের নাম ‘আশা-উন’ পরিত্যাগ করে ‘আতামাহ্’ তথা অন্ধকার শব্দটিকে প্রাধান্য দিয়ে বলতে নিষেধ করেন এবং আঙ্গুর ফলকে ‘কারম’ বলতে বারণ করে বলেন: কারম তো হলো ঈমানদারের ক্বলব।”[223]

১৩. তিনি নিম্নোক্ত বাক্যাবলী ব্যবহার করতে নিষেধ করেন: অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি হয়েছে, আল্লাহ যা চায় এবং তুমি যা চাও তাই হয়[224], আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা, বেশী বেশী কসম করা, অথবা কসমে এরূপ বলা: যদি অমুক কাজ করে, তাহলে সে ইয়াহূদী বা খ্রীষ্টান হয়ে যাবে, মালিক নিজের ক্রিত দাস-দাসীকে আমার বান্দা ও আমার বান্দী বলা, আমার আত্মা ‘খবীস’ কলুষিত হয়ে গেছে এরূপ বলা[225], অথবা শয়তান ধ্বংস হোক বলা, আর ‘হে আল্লাহ ! তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে ক্ষমা কর, এরূপ বলতে নিষেধ করেন, বরং দৃঢ়তা সহকারে দু‘আ করতে বলেন।

---

[223] বুখারী, মুসলিম।

[224] বরং বলবে : আল্লাহর ইচ্ছে, অতঃপর তোমার ইচ্ছা হলে”।

[225] বরং যদি একান্তই বলতে হয়, তাহলে বলবে: আমার মন খারাপ বা দুর্বল হয়ে পড়েছে।” বুখারী।

১৪. তিনি যুগ বা কালকে গালি দেওয়া, বাতাসকে গালি দেওয়া, জ্বরকে গালি দেওয়া[226], মোরগকে গালি দেওয়া[227] এবং ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের আহ্বান থেকে নিষেধ করেন, যেমন বংশের খোঁটা দেওয়া বা নির্বিচারে বংশের পক্ষপাতিত্ব করা ইত্যাদি হতে নিষেধ করেন।”

[226] জ্বর মানুষের পাপরাশিকে দূর করে যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে।” মুসলিম।

[227] মোরগ সালাতের জন্য ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়।” আবু দাউদ।

(২৬) উঠা-বসা ও চলা-ফেরা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[228]

১. রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের দিকে ভর দিয়ে চলতেন, যেন তিনি নিম্নভুমিতে অবতরণ করছেন, তাঁর চলাফেরা ছিল সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতির, সুন্দর, শান্তশিষ্ট ও ধীরস্থিরভাবে।

২. তিনি কখনও খালি পায়ে, আবার কখনও জুতা পরে চলাফেরা করতেন।

৩. তিনি উট, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার উপর আরোহন করেন, তিনি ঘোড়ার উপর কখনো লাগাম পরানো অবস্থায়, আবার কখনো লাগাম পরানো ছাড়াই আরোহণ করেন, আবার কখনো কাউকে সাওয়ারীর উপর সামনে ও পিছনে উঠিয়ে নিতেন।

৪. তিনি যমীনের উপর, আবার কখনো চাটাইয়ের উপর, আবার কখনো বিছানার উপর বসতেন।

৫. তিনি বালিশের উপর ঠেস লাগাতেন, আবর কখনো নিজের বাম-পার্শ্বের উপর, আবার কখনো নিজের ডান-পার্শ্বের উপর।

৬. তিনি 'কুরফুসা' করে বসতেন[229], তেমনি তিনি কখনো চিৎ হয়ে শোতেন, আবার কখনো এক পায়ের উপর অপর পা রাখতেন,

---

[228] যাদুল মা'আদ, ১/ ১৬১।

দুর্বলতার কারণে প্রয়োজন বিশেষ সাহাবীদের কারো উপর ঠেস লাগাতেন।

৭. তিনি কোনো ব্যক্তি সূর্য ও ছায়ার মাঝখানে বসতে নিষেধ করেন।

৮. তিনি কোনো বৈঠক আল্লাহর যিকর হতে খালি হওয়া অপছন্দ করে বলেন: "যে কেউ কোনো বৈঠকে বসে আল্লাহর যিকর না করে, তাহলে সেই বৈঠক আল্লাহর নিকট তার জন্য হতাশা ও আক্ষেপের কারণ হবে।"[230]

৯. তিনি আরো বলেন: যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসলো যেখানে অত্যাধিক আলাপ- আলোচনা হয়, আর সে ঐ মজলিস হতে উঠার পূর্বে

«سبحانكَ اللَّهُمَّ وبحمدكَ، أشهدُ أَنْ لَا إلهَ إِلَّا أَنْتَ، أستغفرُكَ وأتوبُ إليك»

'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া-বিহামদিকা, আশহাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লা আন্তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া-আতূবু ইলাইকা।"

---

[229] কুরফুসা বলা হয়, নিতম্ব মাটিতে রেখে হাঁটুদ্বয় খাড়া করে পেটের সাথে হাটু মিশিয়ে দুই হাত দিয়ে দুই পায়ের নলা জড়িয়ে ধরা।

[230] আবু দাউদ।

“তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ্! তোমারই প্রশংসার সাথে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মা‘বূদ নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি।” এ দু‘আটি পাঠ করলো, তাহলে তার জন্য তা কাফ্ফারাস্বরূপ হবে।”[231]

[231] আবু দাউদ, তিরমিযী।

(২৭) সিজদায়ে শুকর প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:[232]

আল্লাহর কোনো সুস্পষ্ট নে'আমত লাভের পর, অনুরূপ কোনো সুস্পষ্ট বিপদ কেটে যাবার পর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদা করা তাঁর এবং সাহাবীদের আদর্শ ছিল।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো প্রয়োজন পূরণের কথা জানানো হলে তিনি সিজদায় পড়ে যান।[233]

---

[232] যাদুল মা'আদ।

[233] ইবন মাজাহ।

(২৮) আশংকা, বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তার চিকিৎসা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[234]

১. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদাপদের সময় বলতেন:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، ورَبُّ الأَرضِ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمُ»

“লা ইলাহ ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতিস সাব‘য়ী ওয়ারাব্বিল আরদ্বি, রাব্বিল ‘আরশিল কারীম।”

“আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মা‘বুদ নেই, তিনি মহান সহনশীল, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মা‘বুদ নেই, তিনি মহান আরশের রব, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মা‘বুদ নেই, তিনি সপ্ত-আকাশ ও পৃথিবীর রব এবং সম্মানিত আরশের মালিক”[235]।

২. তাঁর নিকট কোনো কঠিন ও চিন্তাযুক্ত কাজ আপতিত হলে বলতেন:

---

[234] যাদুল মা‘আদ, ৪/১৮০।

[235] বুখারী, মুসলিম।

«يا حَيُّ يا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَستَغيثُ»

ইয়া-হাইয়্যু ইয়া-ক্বাইয়ুম, বিরাহমাতিকা আস্তাগীস;-

“হে চিরঞ্জীব, হে সদা রক্ষণাবেক্ষণকারী ! তোমারই অনুগ্রহে সাহায্য প্রার্থনা করছি।”[236]

তিনি বলেন: দুশ্চিন্তা, দু:খ-কষ্টে পতিত ব্যক্তির দু‘আ হলো:

«اللَّهُمَّ رَحمَتَكَ أَرجُو؛ فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ»

‘আল্লা-হুম্মা রাহমাতাকা আরজু, ফালা-তাকিলনী ইলা-নাফসী ত্বারফাতা-আইনিন, ওয়া-আসলিহলী শানী-কুল্লাহু, লা-ইলাহা ইল্লা-আন্তা;

“হে আল্লাহ্! তোমারই রহমতের আকাঙ্খী আমি, সুতরাং তুমি চোখের পলক পরিমাণ এক মুহুর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না, তুমি আমার সমস্ত কাজ সুন্দর করে দাও, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মা‘বুদ নেই।”[237]

---

[236] তিরমিযী।

[237] সুনানে আবু দাউদ।

আর কোনো কঠিন কাজ উপনীত হলে তিনি সালাত পড়তেন।”[238]

৩. তিনি আরো বলেন: যদি কোনো চিন্তা-ভাবনা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি নিম্নোক্ত দু‘আটি পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ্ তার দুশ্চিন্তা দূরীভূত করবেন এবং চিন্তা-ভাবনার স্থলে শান্তি-খুশী সঞ্চারিত করবেন:

«اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أمتك، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمِّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَه في كِتَابِكَ، أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِك، أو اسْتأثَرتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ: أَنْ تَجْعَلَ القُرآنَ العَظِيمَ رَبِيعَ قَلبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وجلاءَ حُزْنِي، وذهابَ هَمِّي»

‘আল্ল-হুম্মা ইন্নী ‘আব্দুকা ওয়া-ইবনু ‘আব্দিকা, ওয়া-ইবনু আমতিকা, না-সিয়াতী বিয়াদিকা, মাযিন ফীয়্যা হুকমুকা, আদলুন ফীয়্যা -ক্বাযা-উকা, আস্‌আলুকা বিকুল্লি- ইস্মিন হুয়া-লাকা, সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা, আউ আল্লামতাহু আহাদান মিন খালক্বিকা, আউ আনযালতাহু ফী কিতাবিকা, আউ ইস্তা’সারতা বিহী ফী ইলমিল গাইবে ইন্দাকা, আন-তাজ‘আলাল কুরআনা রাবী‘য়া-ক্বালবী, ওয়া-নুরা সাদ্রী, ওয়া-জালায়া- হুযনী, ওয়া-যাহাবা হাম্মী,

“হে আল্লাহ্! আমি তোমার বান্দা এবং তোমার এক বান্দার পুত্র, আর তোমার এক বান্দীর পুত্র, আমার কপাল তোমারই হাতে, আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার

[238] আবু দাউদ।

ফায়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে চাচ্ছি যেসব দিয়ে তুমি নিজের নমকরণ করেছো অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছো অথবা তোমার সৃষ্টজীবের মধ্যে কাউকে শিখিয়ে দিয়েছো অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছো, এ সবের বিনিময়ে তোমার নিকট এই কাতর প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কুরআনকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদুরণকারী।”[239]

৪. তিনি আশংকার সময় সাহাবীদের এ দু‘আটি শিক্ষা দিতেন:

«أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ من غضبِه وعقابِه وَشَرِّ عبادِه، ومِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وأعوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون»

‘আ‘উযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মা-তি, মিন গযবিহী ওযা ‘ইক্বাবিহী, ওয়া শাররি-‘ইবাদিহী, ওয়া মিন হামাযা-তিশ শায়াত্বীনি, ওয়া আ‘উযু বিকা-রাব্বি- আঁই য়াহদুরূন।”

“আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর গযব ও আযাব হতে এবং তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে, আর

[239] মুসনাদে আহমদ।

শয়তানদের কুমন্ত্রণা হতে, হে রব! আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি তাদের উপস্থিতি থেকে।”[240]

৫. তিনি আরো বলেন: যে কেউ বিপদে পতিত হয়ে এ দু‘আটি পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ সেই বিপদের বিনিময়ে তাকে সাওয়াব প্রদান করবেন এবং সেটা অপেক্ষা উত্তম কিছু তাকে দান করবেন:

«إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي واخْلُفْ لِي خَيْرًا منها»

‘ইন্না-লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজি‘উন, আল্লা-হুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়াআখলিফলী খাইরাম-মিনহা।”

“নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যে এবং আমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ ! আমাকে আমার বিপদের প্রতিদান দান করো এবং সেটা অপেক্ষা উত্তম স্থলাভিষিক্ত কিছু প্রদান করো।”[241]

---

[240] তিরমীযী, আবু দাউদ।

[241] মুসলিম।

(২৯) সফর-ভ্রমন প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[242]:

১. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার ও দিনের প্রথম দিকে সফরে রওয়ানা হওয়া হওয়া পছন্দ করতেন।”[243]

২. সফরসঙ্গী ছাড়া মুসাফিরের পক্ষে রাতে একাকী সফর করা তিনি পছন্দ করতেন না। অনুরূপ কোনো ব্যক্তি একাকী সফর করা তিনি অপছন্দ করতেন।”[244]

৩. তিনি মুসাফিরদের প্রতি নির্দেশ জারী করেন যে, তারা তিনজন হলে যেন নিজেদের মধ্য হতে একজনকে আমীর নিযুক্ত করে।”[245]

৪. তিনি সাওয়ারীতে আরোহণ করে তিনবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলতেন। অতঃপর নিম্নোক্ত দু‘আসমূহ পাঠ করতেন:-

﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقۡرِنِينَ ١٣﴾ [الزخرف: ١٣] «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سفَرِي هذا البِرَّ والتقوى، ومن العملِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّن عَليْنَا سَفَرَنَا هَذَا واطْوِ عَنَّا بُعْدَه، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصاحبُ في السفرِ، والخليفةُ في الأهلِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا في سَفَرِنَا واخْلُفْنَا في أَهْلِنَا»

---

242 যাদুল মা‘আদ, ১/৪৪৪।

243 বুখারী, মুসলিম।

244 বুখারী।

245 আবু দাউদ।

'সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা, ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন, ওয়া-ইন্না ইলা-রবিবনা লামুনক্বালিবুন,

আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা-হাযাল বিররা্ ওয়াত তাক্বওয়া, ওয়ামিনাল আমালে মা তারদ্বা, আল্লা-হুম্মা হাওয়েন 'আলাইনা সাফারানা-হাযা, ওয়াত্বওয়ি 'আন্না বু'দাহ্, আল্লা-হুম্মা আসহিবনা ফী-সাফারিনা, ওয়াখলুফনা ফী আহলিনা।"

"পাক-পবিত্র সেই মহান সত্বা,যিনি এটিকে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় একে বশীভুত করতে আমরা সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্য আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী,

হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করছি নেকী ও তাক্বওয়ার এবং এমন আমলের সামর্থ যাতে তুমি রাযী-খুশী হও, হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ-সাধ্য করে দাও এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য গুটিয়ে দাও, হে আল্লাহ! তুমি সফরে আমাদের সাথী এবং পরিবারে আমাদের প্রতিনিধি রক্ষণাবেক্ষণকারী হোন।"[246]

আর তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে এ দু'আটি অতিরিক্ত পড়তেন:

---

[246] মুসলিম।

«آيبونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»

আ-য়েবূনা তা-য়েবূনা 'আ-বিদূন, লি-রব্বিনা হামিদূন,

"আমরা প্রত্যাবর্তনকারী নিরাপত্তার সাথে, আমরা তাওবাকারী, আমরা নিজেদের প্রভুর ইবাদতকারী ও প্রশংসাকারী।"[247]

৫. যখন তিনি উঁচু ভুমিতে উঠতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর বলতেন এবং যখন সমভুমি-উপত্যকার দিকে নামতেন 'সুবহানাল্লাহ্- বলতেন।"[248]

এক ব্যক্তি বললো: ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আমি সফরে যেতে মনস্থ করেছি, তখন তিনি বলেন: তুমি অবশ্যই 'তাক্বওয়া'- অবলম্বন করবে, আর প্রত্যেক উঁচু জায়গায় উঠার সময় তাকবীর বলবে।"[249]

৬. সফরকালে ভোরের আলো উদ্ভাসিত হলে তিনি বলতেন:

«سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ الله وحُسْنِ بِلَائِهِ عَلَيْنَا، ربَّنَا صَاحِبْنَا وأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا باللهِ مِنَ النَّارِ»

---

[247] মুসলিম।

[248] আবু দাউদ।

[249] তিরমিযী, ইবন মাজাহ।

“সাম্মা‘আ সামি‘য়ূন বিহামদিল্লাহ ওয়াহুসনি বালায়িহী ‘আলাইনা, রাব্বানা সাহিবনা, ওয়া আফদেল আলাইনা, ‘আয়েযান বিল্লাহি মিনান না-রী।”

“এক সাক্ষ্যদানকারী সাক্ষ্য দিল আল্লাহর প্রশংসার, আর অগণিত নিয়ামত আমাদের উপর উত্তমরূপে বর্ষিত হলো, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের সঙ্গে থাকুন, প্রদান করুন আমাদের উপর অফুরন্ত নিয়ামত, আমি আল্লাহর নিকট জাহান্নামের আগুন হতে আশ্রয় প্রার্থনাকারী।”[250]

৭. তিনি সফরকালে পরিবার-পরিজনকে বিদায় দানের সময় বলতেন:

«أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وخَواتِيمَ أَعْمَالِكَ»

‘আস্তাওদিউল্লাহা দ্বীনাকা, ওয়া-আমা-নাতাকা, ওয়া-খাওয়াতীমা আ‘মা-লিকা’

“আমি তোমার দ্বীন-ধর্ম, তোমার আমানত এবং তোমার আমলসমূহের সমাপ্তি আল্লাহর হেফাযতে রেখে যাচ্ছি।”[251]

---

[250] মুসলিম।

[251] আবু দাউদ, তিরমিযী।

৮. তিনি বলেন: তোমাদের কেউ সফরে কোনো স্থানে অবতরণ করলে তখন বলবে:

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

‘আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তা-ম্মাতি মিন শার্রি মা-খালাক;-

“আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে;- তাহলে সেই স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোনো বস্তু তার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।”[252]

৯. তিনি মুসাফিরের প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর অবিলম্বে নিজের পরিবার-পরিজনের নিকট আসার নির্দেশ দিতেন।

১০. তিনি মহিলাকে মাহরাম পুরুষ সাথী ছাড়া সফর করতে নিষেধ করতেন, যদিও তার দুরত্ব হয় ডাকযোগের তথা প্রায় ১২ মাইল।

তিনি কাফের শত্রুদের হস্তগত হওয়ার আশংকায় কুরআন নিয়ে কাফেরদের দেশে সফর করতে নিষেধ করেছেন।

১১. তিনি মুসলিমকে কাফের-মুশরিকদের মাঝে বসবাস করতে নিষেধ করেন, যদি সে হিজরত করার শক্তি-সামর্থ রাখে এবং

[252] মুসলিম।

বলেন: “কাফের-মুশরিকদের মাঝে যে সকল মুসলিম বসবাস করে, তাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন।”[253]

তিনি আরো কলেন: যে কেউ কাফের-মুশরিকের সঙ্গী হয় এবং তার সাথে বসবাস করে সেও তার মতো।”[254]

১২. তাঁর সফর চার প্রকার ছিল: ১. হিজরতের সফর, ২. জিহাদের সফর, আর এটাই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক ৩. ওমরার সফর, ৪. হজ্জের সফর।

১৩. তিনি সফরে চার রাকাতের ফরয সালাতকে কসর করে দু’রাকাত পড়তেন, সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় হতে ফিরে আসা পর্যন্ত। আর তিনি সফরে শুধুমাত্র ফরয সালাত আদায় করতেন, তবে তিনি ফজরের সুন্নাত ও বিতর নিয়মিত পড়তেন।

১৪. তিনি স্বীয় উম্মতের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ বা দূরত্ব নির্ধারণ করেননি যা অতিক্রম করার পর সালাত কসর করা কিংবা রোযা ছেড়ে দেওয়া বিধেয় হবে।[255]

---

[253] আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ।

[254] আবু দাউদ।

[255] বরং প্রচলিত অর্থে যাকে সফর বলা হয়, সেই সফরে সালাত কসর করা চলবে।’ অনুবাদক

১৫. তাঁর আদর্শ ছিল না সফরে সাওয়ারীতে আরোহণ কালে 'জম্‌'অ' করা-তথা দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রিত করে আদায় করা, আর না অবতরণের কালে, বরং তিনি শুধু সফর দ্রুতগতিতে হলেই 'জম'অ' করতেন, সুতরাং সূর্য ঢলার আগে তিনি সফর শুরু করলে, তখন যোহরকে আসরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন, অতঃপর সাওয়ারী হতে অবতরণ করে যোহর ও আসর একত্রিত করে আদায় করতেন, আর সফর শুরু করার আগেই সূর্য ঢলে গেলে, তখন তিনি যোহরের সালাত পড়ে সাওয়ারিতে আরোহণ করতেন, অনুরূপ সফর দ্রুতগতিতে হলে তিনি মাগরিবের সালাত বিলম্বিত করে এশার সালাতের সাথে একত্রিত করে এশার ওয়াক্তে আদায় করতেন।

১৬. তিনি সফরে দিবারাত্রে নফল সালাত সাওয়ারীর উপরই পড়তেন, সাওয়ারী যে দিকেই ফিরে আছে সেই দিকেই সালাত আদায় করতেন এবং রুকু-সিজদা ইশারার মাধ্যমে আদায় করতেন এবং সিজদার সময় মাথা রুকু হতে অধিক নত করতেন[256]।

১৭. তিনি মাহে রামযানে সফর করেন এবং রোযা ভঙ্গ করেন, সাহাবীদের রোযা রাখা ও না রাখা উভয়ের অনুমতি দেন।

১৮. তিনি সফরে সর্বদা কিংবা অধিকাংশ সময়ে চর্মের মোজা পরিধান করতেন।

---

[256] কিন্তু ফরয সালাত আদায়ে ইচ্ছা করলে সাওয়ারী হতে অবতরণ করে ক্বিবলার দিকে মুখ করে আদায় করতেন।

১৯. তিনি কোনো ব্যক্তিকে সফরে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার পর হঠাৎ রাত্রিবেলায় পরিবারবর্গের নিকট ফিরে আসতে নিষেধ করেন।”[257]

২০. তিনি বলেন: ফেরেশ্তাগণ সেসব কাফেলার সফরসঙ্গী হয় না, যাদের সাথে কুকুর অথবা ঘন্টা থাকে।”[258]

২১. তিনি সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু’রাকাত সালাত আদায় করতেন, অতঃপর পরিবারের শিশু-কিশোরদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

২২. তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর সাথে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করতেন এবং নিজ পরিবারের লোক হলে তাকে চুমু দিতেন।”

---

[257] বুখারী।

[258] মুসলিম।

৩০. ডাক্তারী-চিকিৎসা ও রোগীর দেখা-শোনা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[259]

১. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শ ছিল নিজের চিকিৎসা করা এবং নিজ পরিবার ও সাহাবীদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসা করার আদেশ করা।

২. তিনি বলেন: আল্লাহ্ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার কোনো চিকিৎসা নেই।"[260] তিনি আরো বলেন: হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা চিকিৎসা করো।"[261]

৩. তিনি তিন প্রকারে রোগীর চিকিৎসা করতেন: ১. প্রাকৃতিক ঔষধসমূহ দ্বারা ২. 'ইলাহী দাওয়া'-তথা শির্কমুক্ত ঝাঁড়-ফুঁক দ্বারা, ৩. উভয়ের সমষ্টির দ্বারা।

৪. তিনি মাদকদ্রব্য ও অপবিত্র বস্তু দ্বারা, চিকিৎসা করতে নিষেধ করেন।

৫. তাঁর সাহাবীদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাকে দেখতে যেতেন, তিনি মরণমুখী ইয়াহূদী ছেলেটিকে দেখতে যান যে তাঁর খেদমত করতো এবং তাঁর মরণমুখী চাচা (আবু তালিব)-কে দেখতে

---

[259] যাদুল মা'আদ, ৪/৯।

[260] বুখারী।

[261] আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ।

যান অথচ সে মুশরিক ছিল এবং উভয়ের উপর ইসলাম পেশ করেন, ইয়াহূদী ছেলেটি ইসলাম গ্রহন করলো, কিন্তু তাঁর চাচা (আবু তালিব) ইসলাম গ্রহণ করেনি।

৬. তিনি রোগীর নিকটবর্তী হতেন এবং তার মাথার নিকট বসতেন এবং তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন।

৭. তাঁর আদর্শ ছিল না যে, রোগীকে দেখতে যাওয়ার জন্য কোনো দিন বা কোনো সময় নির্দিষ্ট করা, বরং তিনি স্বীয় উম্মতের জন্য দিবারাত্র ও সর্বক্ষণ রোগী দেখতে যাওয়ার বিধান প্রদান করেছেন।”

(ক) প্রাকৃতিক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:[262]

১. রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জ্বরের উৎপত্তি, অথবা বলেছেন: কঠিন জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ হতে, সুতরাং তোমরা পানির দ্বারা তা ঠাণ্ডা করো।”[263]

২. তিনি আরো বলেন: “তোমাদের কেউ জ্বরে আক্রান্ত হলে তার উপর তিন রাত যাবৎ ভোরে ঠান্ডা পানি ঢেলে দেওয়া উচিৎ।

৩. তিনি জ্বরে আক্রান্ত হলে এক বালতি পানি আনতে বলতেন, তারপর তার উপর ঢেলে দিতেন এবং গোসল করাতেন। একদা জ্বর

---

[262] যাদুল মা‘আদ, ৪/ ২৩।

[263] বুখারী, মুসলিম।

সম্পর্কে তাঁর নিকট আলোচনা করা হয়, তখন এক ব্যক্তি জ্বরকে গালি দিলে তিনি বলেন: তোমরা জ্বরকে গালি দিও না, কেননা জ্বর মানুষের পাপরাশিকে দূর করে যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে থাকে।"[264]

৪. জনৈক ব্যক্তি এসে বললো: ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আমার ভাই পেটের অভিযোগ করছে, অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার পেট ছুটেছে, অর্থাৎ দস্ত শুরু হয়েছে, তখন তিনি বললেন: তাকে মধু পান করাও।"[265] তিনি সে মধুর সাথে পানি মিশিয়ে খালি পেটে খেতেন।

৫. এক দল লোক মদীনায় এসে 'ইস্তিস্কা'- রোগের অভিযোগ করলে তিনি তাদেরকে বলেন: যদি তোমরা যাকাতের উট চারণক্ষেত্রে গিয়ে সেগুলোর পেশাব ও দুধ পান-করতে, অতঃপর তারা অনুরূপ করলে সুস্থ হয়ে যায়।"[266] আর 'ইস্তিস্কা'-এক প্রকার রোগবিশেষ যাতে পেট ফুলে যায় এবং পিপাসার নিবৃত্তি হয় না।

৬. তিনি ওহুদ যুদ্ধে আহত হলে তাঁর কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা চাটাই-এর একটি টুকরা নিয়ে আগুনে পুড়ে সে ছাই তাঁর ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে সাথে সাথে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।

---

[264] ইবন মাজাহ।

[265] বুখারী, মুসলিম।

[266] বুখারী, মুসলিম।

তিনি উবাই ইবনে কা‘আব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর নিকট একজন ডাক্তার প্রেরণ করেন, সে তার একটি রগ-ধমনী কেটে গরম লৌহা দিয়ে দাগ লাগায়।

তিনি বলেন: (অনেক) রেগের নিরাময় তিনটি জিনিসে, মধু পান করা, সিংগা লাগানো এবং গরম লোহা দিয়ে দাগানো, তবে আমি আমার উম্মতকে গরম লোহা দ্বারা দাগাতে নিষেধ করছি।”[267]

তিনি আরো বলেন: লোহা গরম করে দাগ লাগানো আমি পছন্দ করি না।”[268] অর্থাৎ একান্ত বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া লোহা গরম করে দাগ লাগাবে না, যেহেতু তাতে অত্যধিক কষ্ট রয়েছে।

৭. তিনি অসুখের সময় শিঙ্গা লাগান এবং শিঙ্গাদানকারীকে তার মজুরী প্রদান করেন, আর বলেন: “তোমরা যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও, শিঙ্গা লাগানো তার মধ্যে অন্যতম।”[269] তিনি ইহরাম অবস্থায় ব্যথার কারণে মাথায় শিঙ্গা লাগান।”[270]

তিনি স্বীয় উরুর উপরিভাগে ‘ওসা’-তথা হাড় ভাঙ্গা ছাড়া ব্যথা’-এর কারণে শিঙ্গা লাগান।

---

[267] বুখারী।

[268] বুখারী, মুসলিম।

[269] বুখারী, মুসলিম।

[270] বুখারী।

তিনি তিনটি শিঙ্গা লাগাতেন, একটি স্কন্ধের মধ্যবর্তী পিছনের অংশে এবং অপর দু’টি দু’কাঁধের পার্শ্বের রগের উপর, তিনি (খাইবর হতে ফেরার পথে ইয়াহূদী মহিলা কর্তৃক) বিষ মিশ্রিত বকরী হতে আহার করার পর স্কন্ধের মধ্যবর্তী পিছনের অংশে তিন বার শিঙ্গা লাগান এবং তিনি সাহাবীদের শিঙ্গা লাগানোর নির্দেশ দেন।

৮. কেউ মাথা ব্যথার অভিযোগ করলে তিনি তাকে বলতেন: তুমি শিঙ্গা লাগাও। আর কেউ তার দু’পায়ের ব্যথার অভিযোগ করলে তাকে মেহেদী দ্বারা পাঁদ্বয় খেজাব-রং করার নির্দেশ দিতেন।”[271]

৯. সুনানে তিরমিযীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লামের খাদেমা উম্মু রাফে‘অ সালমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত, কোনো সময় তাঁর শরীরে আঘাত লাগলে, অথবা কাটা বিদ্ধ হলে, তিনি তার উপর মেহেদী লাগাতেন[272]।

১০. তিনি আরো বলেন: ‘এরকুন নাসা’ রোগের নিরাময় হলো দুম্বার পাছার নির্জাস, যা প্রতি দিন প্রত্যুষে থুতুর উপর তথা মুখ ধৌত করার পূর্বে পান করবে।”[273]

আর ‘এরকুন নাসা’ সেই ব্যাথাকে বলা হয়, যা উরুর উপরিভাগের জোড়া থেকে শুরু হয়ে পিছন দিয়ে নিচের দিকে নেমে আসে।

---

[271] আবু দাউদ।

[272] তিরমিযী।

[273] ইবন মাজাহ।

১১. তিনি শরীর কশা ও পেট মলীন ও নরম করার ঔষধ সম্পর্কে বলেন, “তোমরা নীম-পাতা ও জিরা ব্যবহার করো, কেননা তাতে প্রত্যেক রোগের নিরাময় রয়েছে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া।”[274]

১২. তিনি আরো বলেন: তোমাদের সর্বোত্তম সুরমা হলো ‘ইস্মদ’- তথা কালো সুরমা, যা চক্ষু পরিস্কার করে এবং চুল উৎপন্ন করে।”[275]

১৩. তিনি আরো বলেন: যে ব্যক্তি প্রত্যুষে সাতটি আলীয়া তথা ‘আজওয়া খেজুর খেয়ে নেবে, সে দিন কোনো বিষ বা জাদুটোনা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।”[276]

১৪. তিনি আরো বলেন: তোমরা রোগীদেরকে পানাহারের উপর জবরদস্তি করো না, কেননা আল্লাহই তাদেরকে পানাহার করান।”[277]

১৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে চক্ষুপীড়া অবস্থায় খেজুর খাওয়াতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, তবে কয়েকটি খেজুর খাওয়ায় সম্মতি দেন, আর তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে ‘রুতাব’-তথা তাজা খেজুর হতে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেন যখন সে চক্ষুপীড়ায় ভুগছিল।

---

[274] ইবন মাজাহ।

[275] আবু দাউদ, ইবন মাজাহ।

[276] বুখারী, মুসলিম।

[277] তিরমিযী, ইবন মাজাহ।

১৬. তিনি বলেন: যখন তোমাদের কারো খাবারের পাত্রে মাছি পড়ে, তাহলে অবশ্যই গোটা মাছিটা তাতে ডুবিয়ে দেবে, অতঃপর মাছিটি দূরে ছুড়ে ফেলে দেবে, কারণ তার এক ডানাতে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা, আর অপর ডানাতে রোগজীবাণু রয়েছে, আর মাছি প্রথমে রোগজীবানুযুক্ত পাখাটি খাবারের মধ্যে ঢুকিয়ে থাকে, তাই দ্বিতীয় ডানাটা পাত্রে ঢুকিয়ে দিতে হবে।"[278]

১৭. তিনি আরো বলেন: 'তালবীনা' রোগীর প্রাণে শক্তি সঞ্চার করে এবং দুশ্চিন্তা দূরীভূত করে।"[279]

আর 'তালবীনা' হলো এক প্রকার লঘু পাক খাদ্য, যা গম-যবের আটা ভুষি সহ পানিযোগে তৈরী করা হয়।

১৮. তিনি বলেন: তোমরা কালাজিরা ব্যবহার করো, কেননা তাতে মৃত্যু ব্যতীত আর সকল রোগের চিকিৎসা রয়েছে।"[280]

১৯. তিনি বলেন: তোমরা কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে পলায়ন করো, যেভাবে পলায়ন করে থাকো ব্যাঘ্র থেকে।"[281]

---

[278] বুখারী।

[279] বুখারী, মুসলিম।

[280] বুখারী, মুসলিম।

[281] বুখারী।

তিনি আরো বলেন: অসুস্থ রোগীকে সুস্থ ব্যক্তির নিকট রাখবে না।”[282]

২০. সাক্বীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের মধ্যে এক লোক কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ রোগী ছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি দূত প্রেরণ করে বলেন: তুমি ফিরে যাও, আমরা তোমরা বাই‘আত গ্রহণ করে নিয়েছি।”[283]

(খ) ‘ইলাহী দাওয়া’-তথা ঝাড়ফুঁক দ্বারা চিকিৎসা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা[284]:

১. রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বিন-শয়তান ও বদ-নযর হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং বদ-নযর দূরীকরণার্থে ঝাড়ফুঁক করার নির্দেশ দেন, আর বলেন: “বদ-নযর লাগা এক বাস্তব সত্য, যদি কোনো বস্তু ভাগ্য অতিক্রম করে থাকতো, তাহলে বদ-নযরই ভাগ্য অতিক্রম করতো, আর যদি তোমাদের কারো নিকট গোসল করে পানি দানের জন্য অনুরোধ করা হয়, তখন সে যেন গোসল করে পানি দেয়।”[285]

---

[282] বুখারী, মুসলিম।

[283] মুসলিম।

[284] যাদুল মা‘আদ, ৪/১৪৯।

[285] মুসলিম, অতঃপর গোসলে ব্যবহৃত সেই পানি দ্বারা বদ-নযরগ্রস্ত রোগী গোসল করবে।

২. তিনি একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন যে, তার চেহারায় বদ-নযর লাগার লাগার আলামত রয়েছে, তখন তিনি বললেন: একে ঝাঁড়ফুঁক কর, কেননা তার উপর বদ-নযর লেগেছে।"[286] উক্ত হাদীসে উল্লেখিত 'সাফ'আহ'-শব্দের মর্মার্থ: জ্বিন-শয়তানের বদ-নযর।

৩. তিনি সেই সাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেন, যিনি বিচ্ছুতে দংশিত ব্যক্তিকে সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়ফুঁক করার ফলে সে সুস্থ হয়েছিল, কে তোমাকে জানালো যে, সূরা ফাতিহা ঝাড়ফুঁকের কাজ করে?[287]

৪. এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো: গতরাত আমাকে বিচ্ছু দংশন করেছে, তখন তিনি বলেন: যদি তুমি সন্ধ্যাবেলায় বলতে:

«أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

'আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তা-ম্মাতি মিন শাররি মা-খালাক;

"আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে,- তাহলে কোনো বস্তু তোমরা ক্ষতি করতে পারতো না।"[288]

---

[286] বুখারী, মুসলিম।

[287] বুখারী, মুসলিম।

[288] মুসলিম।

(গ) উভয়ের সমষ্টি সহজ ও উপকারী চিকিৎসা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা:

১. যখন কোনো লোক অসুস্থ হয়ে পড়তো, অথবা আহত কিংবা জখমী হতো, তখন তিনি তর্জনী আঙ্গুলটি যমীনে রাখতেন, অতঃপর তা উঠিয়ে বলতেন:

«بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا»

'বিসমিল্লাহি তুর্বাতু আরদিনা, বি-রীক্বাতি বা'যিনা, ইউশফা সাক্বীমুনা, বিইযনি রাব্বিনা;-

"আল্লাহর নামে, আমাদের দেশের মাটি এবং আমাদের একজনের থুতু, আমাদের প্রতিপালকের হুকুমে যেন আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে।"[289]

২. কোনো সাহাবী তাঁর নিকট ব্যথার অভিযোগ করলে তিনি বলেন: তুমি শরীরে ব্যথার স্থানে নিজের হাত রেখে এ দু'আটি সাতবার বলো:

«أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وأُحَاذِرُ»

'আউযু বিইয্যাতিল্লাহি ওয়া ক্বুদরাতিহী মিন শাররি মা-আজিদু ওয়া উহাযিরু; যে অনিষ্ট আমি অনুভব করছি, আর যার আমি আশংকা

[289] বুখারী, মুসলিম।

করছি তা হতে আমি আল্লাহুর নিকট তাঁর মর্যাদা ও কুদরতের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”[290]

আর তিনি সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ে নিজের কোনো বিবির ব্যথার স্থানে ডান-হাত বুলাতেন এবং এ দু‘আটি পাঠ করতেন:

«اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَاسَ، واشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا»

‘আল্লা-হুম্মা রাববান নাসে! আযহিবিল বা’স, ওয়াশফি আন্তাশ শাফি, লা-শিফাআন্ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আন্ লা-ইউগাদিরু সুকুমান;- অর্থাৎ হে আল্লাহ্ মানুষের প্রভু! এ ব্যথা দূর করে দাও এবং আরোগ্য করে দাও, তুমিই তো একমাত্র শেফাদানকারী, তোমার শেফা ছাড়া আর কোনো শেফা নেই, সুতরাং এমন শেফা দান কর যা কোনো রোগকে না ছাড়ে।”[291]

তিনি রোগী দেখতে গেলে বলতেন:

«لَا بأسَ طهورٌ إنْ شَاءَ اللهُ»

‘লা-বা’ছা, ত্বাহুরুন ইনশা-আল্লাহ্;-

---

[290] মুসলিম।

[291] বুখারী, মুসলিম।

অর্থাৎ ভয়ের কিছুই নেই, ইন-শা আল্লাহ্ পাপরাশী হতে পবিত্রতা (অর্জিত হবে)।”[292]

আল-হামদুলিল্লাহ্ সমাপ্ত।

[292] বুখারী।